গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু
প্রফেসর সৈয়দা নাসরীন বানু
প্রফেসর ইসমাত রুমিনা
সোনিয়া বেগম
গাজী হোসনে আরা
শামসুন নাহার বীথি
সৈয়দা সালিহা সালিহীন সুলতানা
রেহানা ইয়াছমিন

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান একটি জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। এই বিষয়ে অর্জিত দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও এর অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে, গৃহ ও গৃহের বাইরে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবিলা করতে এবং গৃহপরিবেশে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য দক্ষ ও কৌশলী করে তুলবে। **সপ্তম** শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি এসব বিষয় বিবেচনা করে এবং সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	ক বিভাগ– গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহসম্পদ	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর ও গৃহসম্পদ	২–১১
দ্বিতীয়	গৃহসামগ্রী ক্রয়	১২–১৬
তৃতীয়	গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করার নীতি	১৭–৩০
	খ বিভাগ– শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	
চতুর্থ	পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে শিশু	৩২–৩৯
পঞ্চম	শিশুর বিকাশে খেলাধুলা	৪০–৫০
ষষ্ঠ	প্রতিবন্ধী শিশু	৫১–৫৯
সপ্তম	জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকার	৬০–৬৭
	গ বিভাগ– খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য	
অষ্টম	খাদ্য উপাদান, পরিপাক ও শোষণ	৬৯–৮৩
নবম	মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী	৮৪–৯২
দশম	রোগীর পথ্য ও পথ্য পরিকল্পনা	৯৩–১০১
একাদশ	খাদ্য সংরক্ষণ	১০২–১১০
	ঘ বিভাগ– বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন তন্তু	
দ্বাদশ	বয়ন তন্তুর গুণাগুণ	১১২–১১৭
ত্রয়োদশ	বস্ত্র অলংকরণ	১১৮–১২৬
চতুর্দশ	পোশাকের পারিপাট্য ও ব্যক্তিত্ব	১২৭–১৩১
পঞ্চদশ	পোশাকের পরিচ্ছন্নতা	১৩২–১৪৪

ক বিভাগ

গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহসম্পদ

গৃহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি কতগুলো ধারাবাহিক স্তরের সমষ্টি। সকল কাজেই স্তরগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়। পারিবারিক বিভিন্ন সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ সহজিকরণের কৌশল জেনে এবং তা প্রয়োগ করে অর্থ, শক্তি ও সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায়। গৃহসামগ্রী ক্রয়ের উপায় জানা থাকলে এবং ভোক্তা হিসেবে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে সঠিক সামগ্রী ক্রয় করা যায়। তাছাড়া শিল্পনীতি ও শিল্প উপাদান সম্পর্কে জেনে যথাযথভাবে কক্ষসজ্জা করে গৃহকে আকর্ষণীয় ও মনোরম করা যায়।

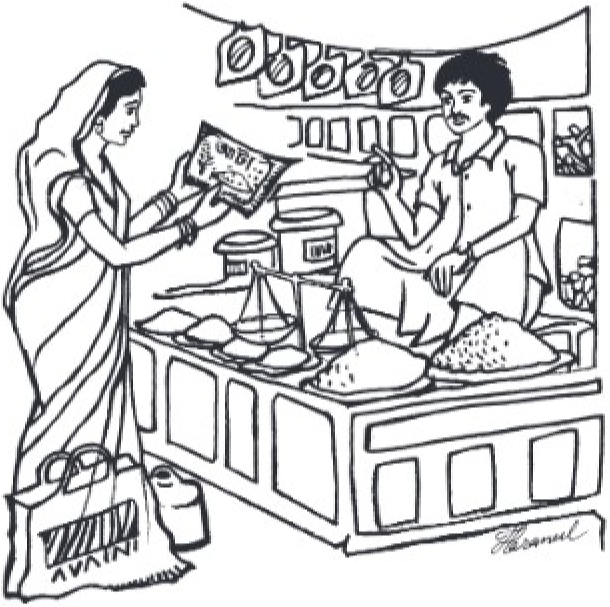

এই বিভাগ শেষে আমরা–

- গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তরগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহসম্পদের শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা তৈরি করতে পারব।
- গৃহের কাজ সহজিকরণের কৌশল প্রয়োগ করতে পারব।
- গৃহসামগ্রী ক্রয়ের কৌশল ব্যাখ্যা করতে এবং ভোক্তা হিসেবে নিজের অধিকার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহকে আকর্ষণীয় ও মনোরম করার ক্ষেত্রে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম অধ্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর ও গৃহসম্পদ

পাঠ ১ – গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর

মানুষের জীবনে বিভিন্ন রকম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করি। কাজগুলো করার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম সম্পদ ব্যবহার করে থাকি। আমাদের চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। আর তাই সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য আমাদের যে সম্পদ আছে, তার ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাকে এক কথায় গৃহ ব্যবস্থাপনা বলে। তাই বলা যায় যে, গৃহ ব্যবস্থাপনা পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতগুলো কর্মপদ্ধতির সমষ্টি। আর এ পদ্ধতি কতগুলো ধারাবাহিক স্তর বা ধাপের সমন্বয়ে গঠিত, যা গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর হিসেবে পরিচিত। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তরগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

পরিকল্পনা – গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম স্তর হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন। যেকোনো কাজ করতে গেলে কাজটি কেন করা হবে, কীভাবে করা হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার নাম পরিকল্পনা। পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে পরবর্তী কাজগুলো করা হয়। সেজন্যই পরিকল্পনাকে যেকোনো কাজের মূল ভিত্তি বলা হয়। অন্যভাবেও বলা যায়, পরিকল্পনা হলো লক্ষ্য অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের পূর্বাভাস। লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কী কাজ করা হবে, কেন করা প্রয়োজন, কে বা কারা এ কাজ করবে, কখন ও কীভাবে প্রতিটি কাজ করা হবে ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনার সময় মনে রাখতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যর মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হয়। সকলের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রেখে পরিকল্পনা করতে হয় এবং এটা যেন সহজ সরল হয়, যাতে সবাই বুঝতে পারে। প্রয়োজনে পরিকল্পনায় কিছু রদবদল করার সুযোগও থাকতে হবে। পরিকল্পনাটা যেন বাস্তবমুখী হয় এবং সবার মিলিত প্রচেষ্টায় তা যেন কার্যকর করা যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

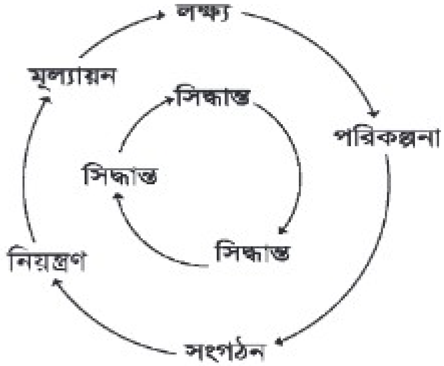

গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তরের চক্রাকার ধারাবাহিক বিন্যাস।

সংগঠন – পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজের সংযোগসাধন করার নাম সংগঠন। গৃহ ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় এ স্তরে কোন কাজ কীভাবে করলে ভালো হবে, কোথায় করা হবে, কে বা কারা করবে, কোন কাজে কাকে নিয়োজিত করা হবে, কী কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে এসব বিষয় ঠিক করা হয়। এক কথায় কাজ, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। কাজের প্রতি উৎসাহ, দক্ষতা, মনোযোগ থাকলে কাজের ফলাফল ভালো হয়। কোনো কাজের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায় সংগঠন দ্বারা। সংগঠনস্তরে

পরিকল্পনালব্ধ কাজের যুক্তিসংগত বিন্যাস করা হয়। সুতরাং বলা যায় যেকোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

নিয়ন্ত্রণ– গৃহীত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ও সংগঠনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করে তোলাকে নিয়ন্ত্রণ বলে। গৃহ ব্যবস্থাপনার তৃতীয় এ স্তরটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা যত ভালোই হোক, তা যদি বাস্তবায়ন না করা যায় তাহলে কখনই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। নিয়ন্ত্রণ স্তরটি কয়েকটি পর্যায়ে এগিয়ে চলে। **প্রথম পর্যায়ে** কাজে সক্রিয় হওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ উদ্যোগ নিয়ে কাজটা শুরু করা। কী কাজ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে তা জানা থাকলে কাজ শুরু করা সহজ হয়। **দ্বিতীয় পর্যায়ে** কাজের অগ্রগতি লক্ষ করা হয়। অর্থাৎ কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। **তৃতীয় পর্যায়ে** পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। কোনো সমস্যা দেখা দিলে গৃহীত পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল করে **নতুন** কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই হলো খাপ খাওয়ানো।

মূল্যায়ন – গৃহ ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ স্তরের নাম মূল্যায়ন। কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর এর ফলাফল যাচাই করাই মূল্যায়ন। কাজটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারল কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমে জানা যায়। মূল্যায়ন ছাড়া কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ করা যায় না। লক্ষ্য অর্জন হলে সফলতা আসে। এ সফলতা লাভের উপায় ভবিষ্যৎ কাজের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। আর লক্ষ্য **অর্জন** যদি ব্যর্থ হয়, তাহলেও ব্যর্থতার কারণ জেনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধন করে লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়। তাই গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো কতকগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ও গতিশীল পর্যায়ক্রমিক স্তরের সমষ্টি। আর এর প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সেজন্যই গৃহ ব্যবস্থাপনার কাঠামোটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে মূল বিষয়রূপে দেখানো হয়েছে।

কাজ ১– গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর অনুযায়ী একটি ক্লাসপার্টির আয়োজন করতে হলে তোমার কী করতে হবে তা লেখো।

পাঠ ২ – গৃহসম্পদ

সম্পদের ধারণা – বাড়িঘর, জমিজমা, টাকাপয়সা, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদিকে সম্পদ হিসেবে আমরা সবাই জানি। এগুলো আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। তবে গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক স্তর থেকে আমরা জেনেছি যে, পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্পদ ব্যবহার করা হয়। আমাদের লক্ষ্যগুলো অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রকম কাজ করতে হয়। আর এ কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য কতকগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয়। এ জিনিসগুলোই হচ্ছে সম্পদ। সম্পদ দিয়ে পরিবারের বিভিন্ন রকম চাহিদা পূরণ করা যায়। অর্থাৎ সম্পদ হচ্ছে চাহিদা পূরণের হাতিয়ার।

মায়িশা ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। তাই সে নিয়মিত স্কুলে যায়। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সে অনেক বই পড়ে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করে। তার পরীক্ষার ফল সব সময় ভালো হয়। শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ আশাবাদী যে, মায়িশা তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

মায়িশার লক্ষ্য অর্জনের পেছনে কাজ করছে তার মেধা, অধ্যাবসায় ও সময়জ্ঞান। এগুলো তার নিজস্ব গুণাবলি, যা তার এক ধরনের সম্পদ। আর তার শিক্ষার আয়োজন করতে ও উপকরণ জোগাতে তার পরিবার ব্যয় করছে টাকাপয়সা, সেগুলোও সম্পদ। সুতরাং যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রকম সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা যায়। আমাদের বাড়িঘর, জমিজমা, অর্থ (টাকাপয়সা), বিভিন্ন আসবাব ইত্যাদি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো যেমন সম্পদ; আবার আমাদের বিভিন্ন গুণ যেমন– জ্ঞান, সামর্থ্য, বুদ্ধি, শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা কাজ করি, সেগুলোও সম্পদ হিসেবে পরিচিত।

সম্পদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে

১. **সম্পদের উপযোগিতা** – সকল সম্পদেরই কমবেশি উপযোগিতা রয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে। তবে সম্পদভেদে এর তারতম্য দেখা যায়। যেমন– অর্থ বা টাকা সম্পদ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা যায়। তাই অর্থ বা টাকা সম্পদ।

২. **সম্পদের সীমাবদ্ধতা** – সম্পদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সকল সম্পদই সীমিত। যেমন–একটা পরিবারের সীমিত আয় বা বাস করার জন্য সীমিত জায়গা ঐ পরিবারের সম্পদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে।

৩. **সম্পদের ব্যবহার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত** – একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সম্পদ একত্রে প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটা কাজ করতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থ, সময়, শক্তি, দক্ষতা ইত্যাদি একাধিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। সম্পদের যৌথ প্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

৪. **সকল সম্পদই ক্ষমতাধীন** – সম্পদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটা কারও ক্ষমতাধীনে থাকতে হবে। যদি কোনো জিনিস নিজের মালিকানাধীনে না থাকে বা একে যদি কোনো কাজে না লাগানো যায়, তা হলে তা সম্পদ নয়।

অর্থ, বাড়িঘর, জমিজমা, বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র, ইত্যাদি সম্পদ যা হস্তান্তর করা যায়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা, শক্তি, সামর্থ্য, দক্ষতা, সময়জ্ঞান ইত্যাদি সম্পদ যা কখনো হস্তান্তর করা যায় না। কারণ এগুলো মানুষের নিজস্ব গুণাবলি।

কিছু কিছু সম্পদ আছে যা বৃদ্ধি করার জন্য চর্চা বা অনুশীলনের প্রয়োজন। যেমন– জ্ঞান, স্বাস্থ্য, দক্ষতা, শক্তি ইত্যাদি।

আয় বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় যেমন- চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি করে অর্থসম্পদও বাড়ানো যায়।

কাজ ১– তোমার একটি লক্ষ্য উল্লেখ করো এবং লক্ষ্য অর্জন করতে তুমি কী সম্পদ ব্যবহার করবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

কাজ ২– সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের সম্পদগুলো চিহ্নিত করো।

পাঠ ৩ – সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

সম্পদ মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের হাতিয়ার। সম্পদ নানাভাবে মানুষের অধিকারে আসে। প্রত্যেক মানুষই কম বেশি বিভিন্নরকম সম্পদের অধিকারী। কিন্তু অনেক মানুষের তার সম্পদের ধরন ও পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক ধারনার অভাব রয়েছে। যার ফলে তারা তাদের অজানা সম্পদগুলো ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। গৃহ ব্যবস্থাপনায় আমরা যা কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করি তাই সম্পদ হিসেবে পরিচিত। সম্পদের শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে আমরা সবরকম সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমাদের লক্ষ্যগুলো অর্জনে তার সঠিক ব্যবহার করতে পারি। গৃহ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

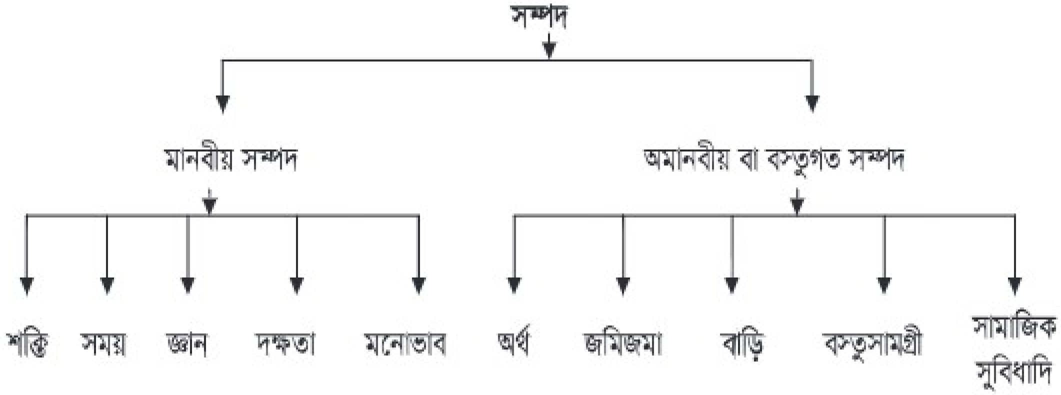

মানবীয় সম্পদ

একটি পরিবারে একাধিক সদস্য বসবাস করে। একটি পরিবারের সদস্যরা অনেক রকম গুণের অধিকারী। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, শক্তি, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি গুণগুলোকে মানবীয় সম্পদ বলা হয়। মানবীয় সম্পদগুলোকে বস্তুগত সম্পদের মতো দেখা বা স্পর্শ করা যায় না। এগুলো মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ। পরিবারের সদস্যরা এই মানবীয় সম্পদগুলোর ব্যবহার করে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আমাদের এই মানবীয় সম্পদগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের ও পরিবারের অনেক উন্নয়ন ঘটাতে পারি।

ফারহান মেধাবী ছাত্র। সে প্রায়ই তার মাকে ঘর গোছানো ও পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করে। কখনো কখনো রান্নার প্রস্তুতির কাজেও সহায়তা করে। মাকে সাহায্য করার ফারহানের এই মনোভাব ও আগ্রহকে নিঃসন্দেহে পরিবারের মানবীয় সম্পদ হিসেবে ধরা যায়। মানবীয় সম্পদগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। অনেক সময় দেখা যায় কারো কোনো বিশেষ কাজের দক্ষতা ও জ্ঞান আছে। কিন্তু কাজ করার মনোভাব বা আগ্রহ না থাকলে কাজটি কখনো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে না।

অমানবীয় বা বস্তুগত সম্পদ

বাড়িঘর, জমিজমা, অর্থ, গৃহের যাবতীয় সরঞ্জাম হতে শুরু করে আসবাব, সবই বস্তুগত সম্পদের মধ্যে পড়ে। সম্পদগুলো ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন রকম কাজ করি, যা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। বস্তুগত সম্পদের মধ্যে অর্থ অর্থাৎ টাকাপয়সা সবচেয়ে মূল্যবান ও কার্যকর সম্পদ। অর্থের বিনিময়ে আমরা অন্যান্য বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহ করে থাকি।

পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানবীয় ও অমানবীয় বা বস্তুগত উভয় প্রকার সম্পদ ব্যবহার করা হয়। তবে লক্ষ রাখতে হবে সম্পদগুলো যেন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। তা না হলে সম্পদের অপচয় হবে। আর আমরাও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। পরিকল্পনা করে সম্পদ ব্যবহার করতে পারলে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের উদাহরণ

	মানবীয় সম্পদ		অমানবীয়/বস্তুগত সম্পদ
সম্পদের নাম	উদাহরণ	সম্পদের নাম	উদাহরণ
সময়	সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হলো সময় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।	অর্থ	বেতন, মজুরী, সঞ্চয়, পুঁজি বিনিয়োগ, ব্যবসা হতে প্রাপ্ত টাকা পয়সা।
জ্ঞান	যেকোনো বিষয়ের সঠিক তথ্য জানা	বস্তুসামগ্রী	গাড়ি, গৃহের আসবাব, সরঞ্জাম, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি।
শক্তি	হাঁটা, চলা বা বিভিন্ন কাজ করার শক্তি	সামাজিক সুযোগ-সুবিধা	স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরি, পার্ক, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি।
দক্ষতা	কোনো বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী		
মনোভাব	সকল ব্যক্তি, পরিবেশ, অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর মনোভাব, সহযোগিতার মনোভাব	জায়গা	বাড়িঘর, জমিজমা ইত্যাদি।

কাজ ১– তোমার মানবীয় সম্পদগুলো চিহ্নিত করো। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেগুলো কীভাবে সহায়তা করছে?
কাজ ২– তোমার পরিবারের সকল বস্তুগত সম্পদের তালিকা করো।

পাঠ ৪ – অর্থ, সময়, শক্তি

অর্থ, সময়, শক্তি এ তিনটি মূলত প্রধান গৃহসম্পদ। প্রতিটি পরিবারে এসব সম্পদ কম বেশি-বিভিন্নরূপে রয়েছে। এ সম্পদগুলো ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করে থাকি। সম্পদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি সম্পদই সীমিত। এই সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে পারিবারিক লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়।

অর্থ – অর্থ পরিবারের একটি অন্যতম প্রধান বস্তুগত সম্পদ। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদাগুলো রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। প্রতিটি পরিবার কোনো না কোনোভাবে এ অর্থ উপার্জন করে। চাকুরি, ব্যবসা, পুঁজি বিনিয়োগ বা যেকোনো পেশার মাধ্যমে পরিবার টাকা পয়সা আয় করে। অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের মধ্যে অর্থের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি। কারণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা আছে। অর্থের বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সংগ্রহ করি। অর্থ দিয়েই পরিবারের সকল ব্যয়ভার মেটানো হয়।

অর্থ যে কাজগুলো করে–

বিনিময়ের মাধ্যম – অর্থ হলো জিনিস বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থাৎ অর্থের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়।
মূল্যের পরিমাপক – টাকার অঙ্কে আমরা জিনিসের দাম জানতে পারি।
ঋণ পরিশোধের মান – ঋণের লেনদেন অর্থের মাধ্যমে হয়।
সঞ্চয়ের ভান্ডার – ভবিষ্যতের জন্য আমরা অর্থ সঞ্চয় করতে পারি।

পারিবারিক জীবনে অর্থকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের চাহিদাগুলো সীমিত অর্থ দ্বারাও পূরণ করা সম্ভব। অর্থকে পরিকল্পনা করে ব্যয় করতে হয়। অর্থ ব্যয়ের জন্য পূর্ব পরিকল্পনাকে বাজেট বলে। সকলেরই বাজেট করে অর্থ ব্যয় করার অভ্যাস করতে হবে। তাহলে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ করতে পারব। আর অকারণে অর্থ ব্যয় করার বদাভ্যাস গড়ে উঠবে না। আমরা মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে শিখব।

সময় – মানবীয় সম্পদগুলোর মধ্যে সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সময় প্রকৃতির নিয়মে বয়ে চলে। তবে জন্মের পর থেকেই আমরা এ সম্পদের অধিকারী হয়ে যাই। সময় সবচেয়ে সীমিত সম্পদ এবং একে পরিমাপ করা খুবই সহজ। এর পরিমাণ সবার জন্য সমান। যেমন– সবার জন্যই চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন। কখনোই একে বাড়ানো যায় না। একে সঞ্চয়ও করা যায় না। তাই সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। অযথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সময়ের সঠিক পরিকল্পনা করে আমরা যদি কাজ করি, তাহলে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারব এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।

রূপম প্রতিদিন ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে উঠে। সকাল সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত পড়ালেখা করে। এগারটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকে। বাসায় ফিরে বিকালে মাঠে খেলতে যায়। রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত আবার পড়ালেখা করে। রাত এগারটায় ঘুমিয়ে পড়ে। দৈনন্দিন অন্যান্য কাজ, বিশ্রাম সবই সে সময়মতো করে। এভাবে রূপমের মতো আমরা সবাই সময় তালিকা করে আমাদের প্রতিদিনের সব কাজ করতে পারি। তাহলে মূল্যবান সময় অবহেলায় নষ্ট হবে না। বরং সময়মতো সব কাজ করে, আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

শক্তি – শক্তি একটি মানবীয় সম্পদ। শক্তি ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন রকম কাজ করে লক্ষ্যে পৌঁছাই। এ সম্পদটা আমরা অর্জন করি। সবার শক্তি এক রকম নয়। প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখি কেউ শক্তি দিয়ে অনেক কাজ করতে পারে, আবার কেউ অল্পতেই শক্তি হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অন্যান্য সম্পদের মতো শক্তি ব্যবহারেও আমাদের যত্নবান হতে হয়। যেকোনো কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সে কাজে আমাদের কম শক্তি ব্যয় হয়। প্রতিদিন আমাদের শক্তি ব্যবহার করে অনেক কাজ করতে হয়। সুতরাং আমাদের কম শক্তি ব্যবহার করে বেশি কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যান্য সম্পদের মতো শক্তিও সীমিত। তাই এই শক্তিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হলে একটা কর্মতালিকা করতে হবে। যার মাধ্যমে শক্তির অপচয় রোধ করা যায়।

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী নীলু গ্রামে থাকে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দূর থেকে পানি আনে। এরপর ঘর, উঠোন ঝাড়ু দেয়, তারপর পুকুরে যেয়ে কাপড় ধুয়ে গোসল করে স্কুলে যায়। ক্লাসে সে প্রতিদিন ক্লান্তিতে ঝিমাতে থাকে। ফলে ক্লাসের পাঠে সে মনোযোগ দিতে পারে না।

পরপর অনেকগুলো কঠিন কাজ করার ফলে নীলুর শক্তি শেষ হয়ে যায়। ফলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নীলুর মতো অবস্থায় না পড়তে হলে শক্তি ব্যবহারের উপায়গুলো জেনে রাখা দরকার।

- দৈনন্দিন কাজের একটা তালিকা থাকবে।
- গুরুত্ব অনুসারে কাজগুলো সাজাতে হবে।
- একটা কঠিন কাজের পর হাল্কা কাজ করতে হবে।
- বিশ্রাম, ঘুম, বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কাজ করার বয়স, দক্ষতা, সামর্থ্য বিবেচনা করতে হবে।

কাজ ১– ছুটির দিনে তোমার সময় ও কাজের তালিকা তৈরি করো।
কাজ ২– তোমার হাত খরচের টাকা থেকে কীভাবে সঞ্চয় করবে লেখো।

পাঠ ৫ – কাজ সহজকরণের কলাকৌশল

আমরা জেনেছি সময় ও শক্তি হচ্ছে খুবই সীমিত দুটো সম্পদ। দুটোর মধ্যে সময় একেবারেই সীমিত, যা সবার জন্য সমান। সময় ও শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে প্রতিদিন অনেক কাজ সহজে করা যায়।

কাজ সহজকরণ বলতে বোঝায়–

- নির্দিষ্ট একটা কাজে অল্প সময় ও শক্তি ব্যয় করা।
- নির্দিষ্ট সময় ও শক্তি ব্যয় করে অধিক কাজ করা।

কাজ সহজিকরণের বিভিন্নরকম কৌশলগুলো আয়ত্ত করে ফেললে কাজগুলো সহজ হয়ে যায় এবং সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করে কাজ সহজ করার বিভিন্ন কৌশল হিসেবে পাঁচ ধরনের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

১। দেহের অবস্থান ও গতিতে পরিবর্তন – কাজ করার সময় দেহের সঠিক অবস্থান ও সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রাখলে কম শক্তি ব্যয়ে বেশি কাজ করা যায়। যেকোনো কাজ করার সর্বোচ্চ ও স্বাভাবিক পরিসর সম্পর্কে ধারণা থাকলে কম শক্তি ব্যয়ে কাজটি সহজেই করা যায়। একথা মনে রেখে কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো হাতের নাগালের মধ্যে রাখা। কোনো কিছু কাটার সময় হাতের গতি ওপর থেকে নিচ দিকে থাকলে খুব সহজে কাজটা করা যায়।

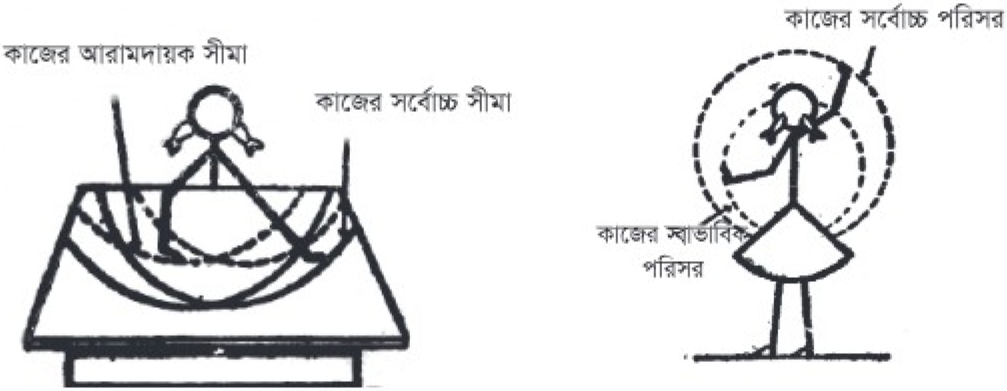

কাজের স্বাভাবিক পরিসরে কাজ করলে কম শক্তি ব্যয় হয়

২। কাজ করার স্থানের ও কাজের সরঞ্জামের পরিবর্তন– কাজের জন্য স্থান ও সরঞ্জামের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে কাজ সহজ করা যায়। প্রত্যেক কাজের একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকে এবং সেখানে কাজটি করতে পারলে সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করা যায়। যেমন– রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘর থাকলে অথবা রান্নাঘরের একপাশে খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলে সময় ও শক্তি ব্যয় কমে যাবে। প্রত্যেক কাজের সরঞ্জামগুলো নির্ধারিত স্থানে রাখলে সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। বসার টুল, চেয়ার ও টেবিল ইত্যাদি সঠিক উচ্চতায় হলে আরামদায়ক অবস্থায় কাজ করা যায়। সামর্থ্য থাকলে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, ফিল্টার, প্রেসার কুকার ইত্যাদি ব্যবহার করে সময় ও শক্তি বাঁচানো যায়।

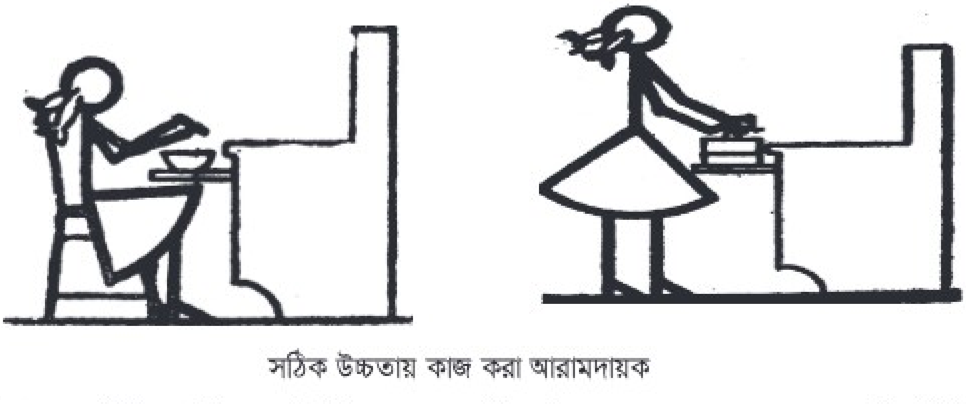

সঠিক উচ্চতায় কাজ করা আরামদায়ক

৩। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তন – কোনো কিছু উৎপাদন বা প্রস্তুত করার পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তন এনে কাজ সহজ করা যায়। যেমন–বাড়ি পরিষ্কার করার সময় বাড়ির প্রতিটি ঘর

আলাদাভাবে ধোয়ামোছা না করে, প্রথমে সব ঘর ঝাড়ু দিয়ে এরপর ঘরগুলো মুছলে সময় ও শক্তি কম ব্যয় হয়। একইভাবে বুদ্ধিমান গৃহিণী চুলায় ভাত চড়িয়ে দিয়ে সেই সময়ে আরো কিছু কাজ করে নিতে পারেন।

৪। উৎপাদিত দ্রব্যে পরিবর্তন – উৎপাদিত দ্রব্যে পরিবর্তন করে কাজ সহজ করা যায়। যেমন- সালাদ বানানোর সময় শসা বা টমেটো মিহিকুচি না করে টুকরা করে কাটলে সময় ও শক্তি কম খরচ হয়। বাজার থেকে কাটা মাছ, স্লাইস করা পাউরুটি কিনে আনা যায়।

৫। কাজে বিভিন্ন উপকরণের পরিবর্তন – আজকাল গৃহের কাজ সহজ করার জন্য বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন— জন্মদিন, বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেকে ডিসপোজেবল প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এসব জিনিস একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া হয়, ফলে ধোয়ামোছার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় হয় না। এভাবে বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে আমরা প্রতিদিনের কাজগুলো সহজভাবে করতে পারি। কাজ করার সবচেয়ে ভালো পন্থাটি বেছে নিলে অল্প সময় ও শক্তিতে অনেক কাজ করা সম্ভব।

কাজ ১– তোমার পরিবারের প্রতিদিনের বিভিন্নরকম কাজ সহজিকরণের কৌশলগুলো চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

কাজ ২– তুমি তোমার ঘরটি পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে যেসব সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করো তা উল্লেখ করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তরগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়?

ক. সংগঠন
খ. লক্ষ্য
গ. নিয়ন্ত্রণ
ঘ. পরিকল্পনা

২. গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তরগুলোকে চক্রাকারে সাজালে নিয়ন্ত্রণের পর কোন স্তরটির স্থান–

ক. সংগঠন
খ. পরিকল্পনা
গ. মূল্যায়ন
ঘ. সিদ্ধান্ত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সচেতন গৃহিণী মনিরা সব সময় কেনাকাটা করতে যাওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদের কার কী প্রয়োজন তা জেনে নেন এবং সর্বোচ্চ কত টাকার মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানো যায় তা চিন্তা ভাবনা করেন।

৩. মনিরার অনুসৃত পদ্ধতিটিকে কী বলে?

ক. কর্মতালিকা
খ. বাজেট
গ. মেনু পরিকল্পনা
ঘ. দ্রব্যতালিকা

৪. মনিরা বেগমের অভ্যাসের কারণে তাঁর পরিবারে সদস্যদের–

i. অর্থের অপব্যবহার কমবে
ii. প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটবে
iii. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. গ্রামে বসবাসকারী রহিমা তার স্বল্প আয়ে সংসারের যাবতীয় চাহিদা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করতে চেষ্টা করেন। রান্নাঘর থেকে পানির চাপকল দূরে হওয়ায় তিনি পানি বালতিতে ভরে রাখেন। রান্নার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হাতের নাগালে মাটির তৈরি তাকে রাখেন। যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রান্না শেষ করে তিনি বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে যান।

ক. সম্পদ কী?
খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?
গ. রান্নার পূর্বে রহিমার গৃহীত পদক্ষেপগুলো কাজ সহজ করার কোন কৌশলটির পরিচায়ক– ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'রহিমা গৃহ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করেন' বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

২. রসুলপুর গ্রামের মাফুজার স্বপ্ন সফল নারী উদোক্তা হবেন। এ লক্ষ্যে সে তাঁর প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ যেমন– নকশিকাঁথা, চাদর ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করেন। তাঁর কাজের দক্ষতা দেখে ঐ এলাকার মহিলা সংস্থা তাঁকে ঋণ প্রদান করে। মাফুজা ১০ জন নারীকে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন এবং তাদের নিয়ে "সেলাই ঘর" নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বর্তমানে রসুলপুর গ্রাম ও আশপাশের এলাকায় মাফুজার কাজের প্রশংসা অনেক।

ক. গৃহ ব্যবস্থাপনা কী?
খ. মানবীয় সম্পদগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত– বুঝিয়ে লেখো।
গ. কোন সম্পদের প্রভাব মাফুজার মধ্যে লক্ষ করা যায়— ব্যাখ্যা করো।
ঘ. দুই রকম সম্পদের সমন্বয়ে মাফুজার লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়েছে– যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গৃহসামগ্রী ক্রয়

পাঠ ১ – গৃহসামগ্রী ক্রয়ের নীতি

পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন রকম কাজ করার জন্য যেসব সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই গৃহসামগ্রী হিসেবে পরিচিত। এই সামগ্রীগুলো আমাদের অনেক কাজকে সহজ ও আরামদায়ক করে দেয়। উপযুক্তভাবে গৃহসামগ্রী নির্বাচন করে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমরা সময়, শক্তি বাঁচিয়ে অনেক কাজ করতে পারি। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। যেমন–

- রান্নার সামগ্রী– হাঁড়ি, পাতিল, কড়াই, খুন্তি, চুলা, বঁটি, দা, ছুরি , কেটলি, ব্লেন্ডার, প্রেসারকুকার ইত্যাদি।
- খাবার কাজের সামগ্রী – প্লেট, বাটি, গামলা, গ্লাস, জগ, চামচ, কাঁটা চামচ, কাপ, পিরিচ, ট্রে, ট্রলি ইত্যাদি।
- ধোয়া ও পরিষ্কার করার সামগ্রী – মোছার কাপড়, ব্রাশ, ঝাড়ু, বালতি ইত্যাদি।
- লন্ড্রীর কাজের সামগ্রী – সাবান, বালতি, মগ, কাঠের টুকরা, ক্লিপ, হ্যাঙ্গার, ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি।
- সেলাইয়ের সামগ্রী – সুচ, সুতা, মাপার ফিতা, কাঁচি, সেলাই মেশিন ইত্যাদি।
- বাগান করার সামগ্রী – কোদাল, শাবল, নিড়ানি, ঝাঁজরি, বালতি, মগ, কাঁচি ইত্যাদি।
- পড়ালেখার সামগ্রী – বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।
- অন্যান্য সামগ্রী – প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, হাতুড়ি, করাত, স্ক্রুড্রাইভার, টেস্টার, খেলার সামগ্রী ইত্যাদি।

গৃহসামগ্রী ক্রয়ের নীতি– গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা না থাকলে, অনেক সময় সঠিক সামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব হয় না। অর্থের বিনিময়ে সামগ্রীগুলো কেনা হয়। তাই সামগ্রী ক্রয়ের সময় যাতে অর্থের অপচয় না হয়, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আর তাই গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসরণ করতে হবে তা হলো।

- প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা
- ক্রয় পরিকল্পনা
- গুণাগুণ যাচাই
- বাজারমূল্য সম্পর্কে ধারণা

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা– আমাদের অর্থসম্পদ সীমিত বলে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী একসাথে ক্রয় করতে পারি না। তাই প্রয়োজনের ক্রমানুসারে সামগ্রীর একটা তালিকা করে সেখান থেকে যে সামগ্রীটা বেশি জরুরি সেটা আগে ক্রয় করা।যেমন–কোনো পরিবারে একই সময় পানির জগ এবং ফুলদানির চাহিদা থাকলে প্রথমে জগ ও পরে ফুলদানি ক্রয় করতে হবে। বেশি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো আগে কিনলে চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূরণ হয়।

ক্রয় পরিকল্পনা–পরিকল্পনা ছাড়া গৃহসামগ্রী ক্রয় করলে বেশির ভাগ চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। তাই সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা পরিকল্পনা করতে হবে। কোন সামগ্রী কখন, কোন কাজের জন্য, কোথা থেকে কেনা হবে, কেনার সামর্থ্য আছে কি না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়। যেমন– শহরে চুলা কেনার সময় সংগতি থাকলে বড় পরিবারের জন্য দুই বা ততোধিক বার্নারের গ্যাস চুলা ক্রয় করলে, অল্প সময়ে বেশি রান্না করা যাবে। অন্যদিকে গ্রামে গ্যাসের চুলার চেয়ে মাটির চুলার জ্বালানি সহজে ও সুলভে পাওয়া যায়।

গুণাগুণ যাচাই– সামগ্রী ক্রয়ের সময় তার গুণাগুণ যাচাই করে কেনা হলে তা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। সামগ্রীর গুণ বিচারের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন–

১) সময় ও শক্তি বাঁচিয়ে কাজ করার জন্য পণ্য দ্রব্য নির্বাচন করা। অতিরিক্ত ভারী বা বড় আকৃতির সামগ্রীর চেয়ে হাল্কা সহজে নাড়াচাড়া করা যায়, সেগুলো বেশি উপযোগী কারণ এতে সময় ও শক্তি কম খরচ হয়।

২) মূল্য ও উপযোগিতা যাচাই করে সামগ্রী ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় দেশজ কাঁচামালে তৈরি কম মূল্যের সামগ্রী বিদেশি চাকচিক্যময় সামগ্রীর তুলনায় গুণে ও মানে ভালো হয়।

৩) গৃহসামগ্রীগুলো কাজের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হয়। বিভিন্ন ধাতুর বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার, যত্ন, সংরক্ষণের উপায় জেনে সামগ্রী ক্রয় করা উচিত। রান্না করার সামগ্রীর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি পাতিল সুবিধাজনক। আবার ভাজার জন্য লোহার কড়াই উপযোগী। তেমনি প্লেট, গ্লাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি কাঁচের হলে তা বেশি গ্রহণীয়। তবে তা ব্যবহারে বেশি সতর্ক হতে হয়।

৪) প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের আগেই সেটা টেকসই কি না তা বিচার করতে হবে। কোনো সামগ্রীর স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে তার গঠনপ্রণালী ও ধাতুর বৈশিষ্ট্যের উপর। যেমন–কেটলি, ফ্রাইপ্যান ইত্যাদির হাতগুলো কাঠ বা প্লাস্টিক দিয়ে জোড়া দেওয়া থাকে। তাই দ্রব্যটির জোড়ার অংশগুলো ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কি না তা দেখতে হয়।

বাজারমূল্য সম্পর্কে ধারণা– যেকোনো সামগ্রী কিনতে হলে তার মূল্য যাচাই করে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে কেনার চেষ্টা করা উচিত। সেজন্য সামগ্রী কেনার সময় বিভিন্ন দোকান ঘুরে বাজার মূল্য যাচাই করে কিনলে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়।

কাজ ১– এক বছরে তোমার পড়ালেখার জন্য কী কী সামগ্রী দরকার হয় তার তালিকা তৈরি করো।
কাজ ২– কোনো সামগ্রী ক্রয়ের সময় গুণাগুণ যাচাই করলে কী কী সুবিধা হয়, লেখো।

পাঠ ২ – ভোক্তা হিসেবে নিজের অধিকার

তুমি যদি কোনো জিনিস ক্রয় করো, তাহলে তুমি ক্রেতা। আর সে জিনিসটা যদি তুমি ভোগ করো, তাহলে তুমি একই সাথে ক্রেতা ও ভোক্তা। চাহিদা পূরণের জন্য যেকোনো দ্রব্য বা জিনিস আমরা বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে থাকি। প্রায়ই দেখা যায় যে, ক্রেতা বা ভোক্তারা নানানভাবে বিক্রেতার দ্বারা প্রতারিত ও নাজেহাল হচ্ছে। শুধু বিক্রেতারাই নয়, উৎপাদনকারীরা খারাপ মানের দ্রব্য তৈরি করে আমাদের প্রতারণা করছে বা ঠকাচ্ছে।

আমরা ভোক্তারা পণ্য বা দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করি–

- সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভের আশায়
- আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় জন্য
- নিজেকে দক্ষ ক্রেতা বা ভোক্তায় পরিণত করার জন্য

অপরদিকে আমাদের মতো দেশে বেশিরভাগ বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীরা বেশি লাভ করার জন্য যেভাবে আমাদের প্রতারিত করছে -

- জিনিসপত্রের বেশি ও অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ
- দূষিত ও ভেজাল দ্রব্য বিক্রি
- প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার
- দ্রব্যের ওজন ও মাপ ঠিক না রাখা ইত্যাদি

একজন ভোক্তা হিসেবে আমরা যেন আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারি এবং কোনো অবস্থাতেই যেন বিক্রেতাদের দ্বারা প্রতারিত না হই, সে বিষয়ে সবার সচেতন হওয়া দরকার। অর্থকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আমরা যেন সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পেতে পারি, সেজন্যই ভোক্তার অধিকারগুলো আমাদের জানতে হবে। পৃথিবীর সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য সাতটি মৌলিক অধিকার রয়েছে, এগুলো হলো–

নিরাপত্তার অধিকার– ভোক্তাদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিপজ্জনক ও অনিষ্টকারী পণ্য যাতে উৎপাদন ও বাজারে বিক্রি না হয়, সে ব্যাপারে কঠোর নিয়ম থাকতে হবে। ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধে যেন আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে দেশে আইন ও তার প্রয়োগ থাকতে হবে।

জানার অধিকার– যে সব দ্রব্য ভোক্তা ক্রয় করে, সেগুলোর সঠিক মূল্য কত, গুণগত মান কেমন, কী উপাদান দ্বারা তৈরি, ব্যবহারের নিয়ম, মেয়াদকাল ইত্যাদি সম্পর্কে তার জানার অধিকার থাকবে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রব্যের মোড়কের লেবেলে সব তথ্য থাকলে ভোক্তারা পণ্য যাচাই করে কিনতে পারে। ফলে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

অভিযোগ করার অধিকার– যদি কোনো দ্রব্য খারাপ মানের হয় তাহলে ভোক্তা উক্ত দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ভোক্তার অভিযোগ শুনে, সে অনুযায়ী দ্রব্যের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হতে বাধ্য হবে।

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার– কোনো দ্রব্য ব্যবহারে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা দ্রব্যের মান সঠিক না হলে বিক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এটা ভোক্তার একটা অন্যতম অধিকার। আজকাল অনেক বিক্রেতা ভোক্তাকে দ্রব্য ক্রয়ের ক্যাশমেমো দিতে চায় না। কিন্তু ভোক্তাদের সচেতনভাবে ক্যাশমেমো সংগ্রহ করতে হবে। যাতে প্রতারিত হলে বিক্রেতার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা যায়।

বাছাই করার অধিকার– বিভিন্ন বিকল্প দ্রব্য মধ্যে থেকে ভোক্তা তার পছন্দমতো সঠিক দ্রব্যটি বেছে নিতে পারবে। দ্রব্যের গুণগত মান যাচাই করার জন্য প্রয়োজনে পণ্যটি হাত দিয়ে ধরে, নেড়েচেড়ে পছন্দ করার সুযোগ ভোক্তার থাকবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার– সব ভোক্তার সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। হাট– বাজার বা দোকানের পরিবেশ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং যাতে ভোক্তারা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে। ভোক্তার যাতায়াতের সব পরিবেশ যেন দূষণমুক্ত, কোলাহলমুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ভোক্তার শিক্ষালাভের অধিকার– ভোক্তা শিক্ষার অর্থ হলো সেই শিক্ষা যা ভোক্তাদের সঠিক দ্রব্যসামগ্রী বেছে নিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। উন্নত অনেক দেশে ভোক্তাদের শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীদের প্রতারণা বা ভোক্তাকে ঠকানোর বিষয়টি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা যায়। দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দ্রব্যের গুণ ও মানের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে তার ফলাফল ভোক্তাদের জানাতে পারে। তাহলে ভোক্তা দ্রব্যের ভালোমন্দ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবে। এভাবে ভোক্তা শিক্ষালাভ করে সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

কাজ ১– ভোক্তার অধিকার নিয়ে একটা পোস্টার তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোনটি রান্নার সামগ্রী?

ক. খুন্তি খ. প্লেট

গ. চামচ ঘ. গামলা

২. সামগ্রী ক্রয়ের সময় কোনটির উপর গুরুত্ব দিতে হয়?

ক. সামর্থ্য খ. পরিকল্পনা

গ. চাহিদা ঘ. উপযোগিতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চামেলী ডিনার সেট কেনার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি বড় দোকানে যান। পরে আরো কয়েকটি দোকান ঘুরে অবশেষে সে একটা দোকান থেকে একই জিনিস অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে আনে।

৩. ডিনার সেট কেনায় চামেলী কোন বিষয়টি বিবেচনা করেছেন?

ক. বাজারমূল্য খ. ধাতুর বৈশিষ্ট্য

গ. দ্রব্য নির্বাচন ঘ. স্থায়িত্ব যাচাই

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায়ে পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে

i. অর্থের সাশ্রয় হয়
ii. অধিক পণ্য কেনা সম্ভব হয়
iii. সময় ও শক্তি কম খরচ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মুবীনা ইলেকট্রনিক্সের দোকান থেকে ক্যাশমেমো ছাড়া একটি ইস্ত্রি কেনেন। বাসায় ফেরার পথে মেয়ের জন্য এক প্যাকেট জুস কেনেন। মেয়ে জুসটি খেতে গিয়ে খেয়াল করে সেটার মেয়াদ পার হয়ে গেছে। আবার অনেক চেষ্টা করেও মুবীনা তাঁর ইস্ত্রিটিকে চালু করতে না পেরে দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকানদার ইস্ত্রিটি অন্য দোকান থেকে কেনা হয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করেন।

ক. ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় কয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে?
খ. গৃহসামগ্রী কেনার আগে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।
গ. জুস ক্রয়ে মুবীনা তার কোন অধিকারটি প্রয়োগ করেননি– ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ‘ভোক্তা হিসাবে মুবীনার মতো ক্রেতারা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়’– বিশ্লেষণ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করার নীতি

গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করার কাজটি শিল্পের একটি ক্ষেত্র। শিল্প হচ্ছে যেকোনো ধরনের প্রচেষ্টা বা অনুভূতি যা মানুষকে আনন্দ দেয়। এই প্রচেষ্টা কোনো কিছু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে হতে পারে, আবার আচরণের মধ্যে দিয়েও হতে পারে। মানুষের কল্যাণের জন্য সুন্দর উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পের সৃষ্টি হয়। গৃহকে সাজানোর কাজটি যখন এসব উদ্দেশ্য পূরণ করে তখন সেটা শিল্পের মর্যাদা পায়। এখন প্রশ্ন হলো, গৃহকে আমরা আকর্ষণীয় করব কীভাবে? এর জন্য গৃহ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি প্রয়োজন উপযুক্তভাবে গৃহকে সাজানো। এটি অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জা (Interior Decoration) নামে পরিচিত। গৃহকে মনোরম ও আকর্ষনীয় করে তুলতে হলে, যে বিষয়গুলো শেখা দরকার তা এই অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো –

পাঠ ১– শিল্প উপাদান

সুন্দর, সহজ, আকর্ষণীয় সবকিছুই শিল্প। গান করা, ছবি আঁকা যেমন একটি শিল্প তেমনি গৃহকে সুন্দর আরামদায়ক, আকর্ষণীয় করে সাজানোও একটি শিল্প। আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি, তার প্রতিটিতে রং, আকার, উপরিভাগ বা জমিন বা কিছু রেখা থাকে। এগুলো শিল্প সৃষ্টির উপাদান। অর্থাৎ যা কিছু দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করা হয় তাই শিল্প উপাদান। শিল্প উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রং, রেখা, আকার ও জমিন।

রং (Colour) – আমাদের চারপাশে নানা ধরনের রঙের ব্যবহার দেখা যায়। রং দেখার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। রংকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়।

১. **প্রাথমিক রং** (Primary Colour)– যে রং অন্য কোনো কোনো রং থেকে তৈরি করা যায় না, সেগুলোই প্রাথমিক রং। লাল, নীল, হলুদ হলো প্রাথমিক রং।	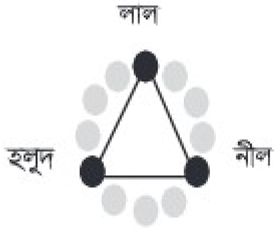
২. **মাধ্যমিক রং** (Secondary Colour)– একই পরিমাণ দুটি প্রাথমিক রং মেশানো হলে যে রঙের সৃষ্টি তাই মাধ্যমিক রং। মাধ্যমিক রংগুলো হলো– i) লাল + হলুদ = কমলা ii) হলুদ + নীল = সবুজ iii) নীল + লাল = বেগুনি	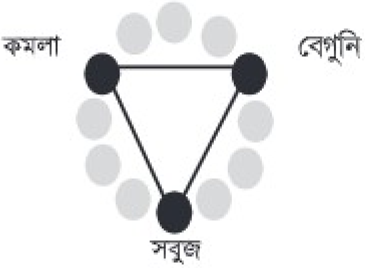

৩. সংমিশ্রিত রং (Tertiary Colour)– সমান পরিমাণ একটি প্রাথমিক রং এবং একটি মাধ্যমিক রঙের মিশ্রণে সংমিশ্রিত রং তৈরি করা যায়।

i) লাল+কমলা = লালচে কমলা
ii) কমলা + হলুদ = হলদে কমলা
iii) হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ
iv) সবুজ + নীল = নীলচে সবুজ
v) নীল + বেগুনি = নীলচে বেগুনি
vi) বেগুনি + লাল = লালচে বেগুনি

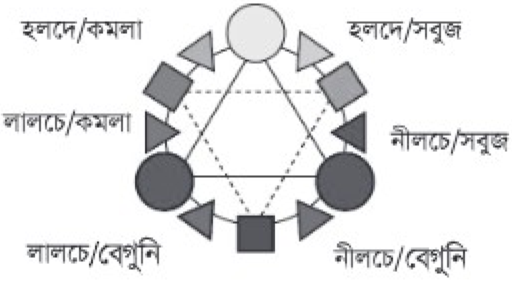

যেকোনো আকার দিয়ে বর্ণচক্র আঁকা যায়

বর্ণচক্র – ১২টি রং চক্রাকারে সাজিয়ে বর্ণচক্র তৈরি করা হয়। বর্ণচক্র দিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, সংমিশ্রিত রঙের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট বোঝা যায়। এ থেকে খুব সহজেই গৃহের আসবাবপত্রের রং, গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণর রং নির্বাচন করা যায়।

রঙের **বিভিন্ন প্রভাব**– একেক ধরনের রং আমাদের মনে একেক ধরনের অনুভূতি জাগায়।

উষ্ণ রং – বর্ণচক্রের উজ্জ্বল রংগুলোকে গরম বা উষ্ণ রং বলা হয়। যেমন–লাল, হলুদ, কমলা।

- উষ্ণ রঙের ব্যবহার পরিবেশে গরম ভাব আনে।
- উষ্ণ রং দৃষ্টির সামনের বস্তুকে কাছে নিয়ে আসে।
- উষ্ণ বা উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে ঘরের আকৃতি ছোট মনে হয়।

শীতল রং– বর্ণচক্রের হালকা রংগুলোকে ঠান্ডা বা শীতল রং বলা হয়। যেমন– নীল, নীলচে সবুজ, সবুজ।

- শীতল রঙের ব্যবহার ঠান্ডা, শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশের অনুভূতি দেয়।
- শীতল রং দৃষ্টির সামনের বস্তুকে দূরে নিয়ে যায়।
- শীতল বা হালকা রঙের ব্যবহারে ঘরকে বড় দেখায়।

গৃহসজ্জাকে আকর্ষণীয় করতে খুব সতর্কতা ও যত্নের সাথে রং নির্বাচনের প্রয়োজন হয়।

কাজ ১– তোমরা হাতেকলমে রং মিশিয়ে বর্ণচক্রের জন্য রং তৈরি করো এবং বর্ণচক্র আঁকো।

রেখা, আকার ও জমিন

রেখা (Line)

রেখা একটি অন্যতম শিল্প উপাদান। কোনো গতিশীল বিন্দুকে রেখা বলা হয়। রেখা সরু ও মোটা হতে পারে, আবার যেকোনো দৈর্ঘ্যের হতে পারে।

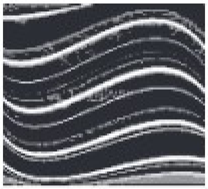
বক্ররেখা

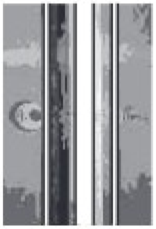
লম্বরেখা

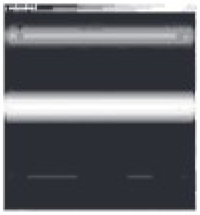
আড়াআড়ি রেখা

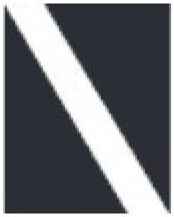
কৌণিক রেখা

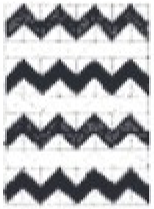
জিগজ্যাগ রেখা

উপরের ছবিগুলোতে বিভিন্ন রকম রেখা দিয়ে নকশা তৈরি করা হয়েছে। এই নকশাগুলো কি তোমার কাছে একইরকম আবেদন সৃষ্টি করছে? এই নকশাগুলো প্রতিটিই পৃথক পৃথক ভাব উপস্থাপন করছে। আঁকাবাঁকা রেখা দিয়ে নকশাটিতে নতুনত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। লম্ব রেখা আপাত দৃষ্টিতে উচ্চতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। আড়াআড়ি রেখা দিয়ে জায়গাটিকে আরও প্রশস্ত বা মোটা মনে হচ্ছে। কৌণিক রেখায় নকশাটির অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও নতুনত্ব ফুটে উঠেছে। জিগজ্যাগ রেখা অন্যান্য রেখার চেয়ে বেশি গতিশীল ও বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম। গৃহকে আকর্ষণীয় করে সাজাতে রেখার এসব বৈশিষ্ট্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

আকার (Form)

কোনো কিছুর সামগ্রিক গঠনকে আকার বলে। আকার যদি ঠিক না থাকে তবে পুরো শিল্পটিই দেখতে অসুন্দর হয়ে যায়। দুই ধরনের আকার আছে। যথা: ১) মুক্ত আকার– জ্যামিতিক আকার ছাড়া সব ধরনের আকার মুক্ত আকার। যেমন– গাছের আকার, ফুলের আকার। ২) জ্যামিতিক আকার– বৃত্ত, চর্তুভুজ, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র ইত্যাদি।

মুক্ত আকার

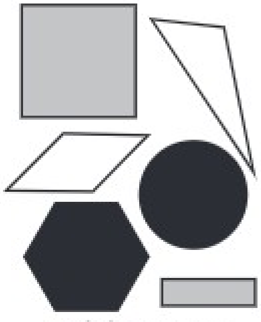
জ্যামিতিক আকার

কোনো বস্তুকে কাজের উপযোগী করে তোলার জন্য আকার তৈরির প্রয়োজন হয়। যেমন–কাঠকে কেটে জোড়া দিয়ে বসার জন্য চেয়ারের আকার ও কাঠামো তৈরি হয়। বস্তু যদি সঠিক আকারের হয়, তবে তা দিয়ে কাজ করা সহজ হয়। যেমন– চেয়ারের আকার ঠিক না হলে বসে আরাম পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আকার ব্যবহার করে নকশায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। যেমন– খাবার টেবিলের আকার কখনো চারকোনা, কখনো গোল, আবার কখনো ডিম্বাকৃতি হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন নকশার আকার নির্বাচন করা হয়।

কাজ ১– বিভিন্ন ধরনের রেখা ব্যবহার করে পাঁচটি নকশা আঁকো।

কাজ ২– জ্যামিতিক আকার ও মুক্ত আকার দিয়ে দুটি নকশা আঁকো।

জমিন (Texture)

সকল বস্তুর উপরিভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন– মাটির দেয়াল, টাইলস-এর মেঝে, আসবাবপত্র ও কার্পেটের উপরিভাগ। এদের মধ্যে কোনোটি খসখসে, কোনোটি চকচকে মসৃণ, আবার কোনোটি উঁচু নিচু হয়ে থাকে। বস্তুর উপরিভাগের বৈশিষ্ট্যই জমিন। চোখে দেখে এবং স্পর্শ করে জমিনের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। জমিন শিল্প সৃষ্টির অন্যতম একটি উপাদান। গরম ও ঠান্ডা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জমিন বড় ভূমিকা পালন করে। যেমন– ভারী ও মোটা জমিনের পর্দা ও কার্পেট শীতকালে ঘরকে গরম রাখে। আবার গ্রীষ্মে হালকা ও পাতলা জমিনের পর্দা ঘরে ঠান্ডার অনুভূতি দেয়। বিভিন্ন ঘরে খোদাই বা নকশা করা আসবাবপত্র বা উঁচু ও নিচু জমিনের গৃহসজ্জার উপকরণ গৃহকে যেমন – আকর্ষণীয় করতে পারে, আবার চকচকে মসৃণ জমিনের মেঝে, জানালার কাচ, পর্দার কাপড় দিয়েও গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জার সৌন্দর্যকে অনেকগুণ বাড়ানো যায়।

চকচকে জমিনের পর্দা

মসৃণ জমিনের মেঝে

উঁচু ও নিচু জমিনের ফুলদানি

খসখসে জমিনের সোফার কভার

ভারী জমিনের কার্পেট

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জমিন

কাজ ৩– পাঁচ ধরনের উপকরণের নাম লেখো যাদের জমিন আলাদা।

পাঠ ২ – শিল্পনীতি

একটি চেয়ার তৈরি করার কথা চিন্তা করা যাক। চেয়ারের পায়ের উচ্চতা যদি ৪৬ সেন্টিমিটার হয় তবে হেলান দেওয়ার অংশ কতটুকু উঁচু হলে বসতে আরাম হবে ও দেখতে সুন্দর লাগবে? চেয়ারের হাতলের নকশার সাথে কি পায়ের নকশার মিল থাকবে? মধ্যবিন্দু থেকে দুই হাতলের দূরত্ব সমান হতে হবে। চেয়ারটিতে কি এমন নকশা দেওয়া যায় যে সবার দৃষ্টি প্রথমে সেখানে যাবে? একই রকমের ছয়টি চেয়ার ব্যবহারে খাবার ঘরের সৌন্দর্য কতটুকু বাড়বে?

এসব মাথায় রেখে যদি কোনো সামগ্রী তৈরি হয় তবে অবশ্যই তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাবে। চেয়ারটি তৈরি করতে যেসব বিষয় লক্ষ করার কথা ভাবা হয়েছে সেগুলো যেকোনো শিল্প সৃষ্টিতেই প্রয়োজন। তাই এভাবে বলা যায়, শিল্প সৃষ্টির জন্য যে নীতিগুলো অনুসরণ করার দরকার হয় সেগুলোই শিল্পনীতি।

শিল্পনীতিগুলো হলো– ক) সমানুপাত (Proportion) খ) ভারসাম্য (Balance) গ) মিল (Harmony) ঘ) ছন্দ (Rythm) ও ঙ) প্রাধান্য (Emphasis)

ক) সমানুপাত–সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় ও মজবুত করার জন্য এই নীতি অনুসরণ করা হয়। একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশের আকার আকৃতি ও অনুপাতের সামঞ্জস্য থাকাই সমানুপাত। এটি অনুধাবনের ব্যাপার। তখন কোনো কিছু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, যখন কোনো বৈশিষ্ট্যের আধিক্য থাকে না আবার স্বল্পতাও থাকে না, তখনই অনুপাত ঠিক আছে বলা হয়।

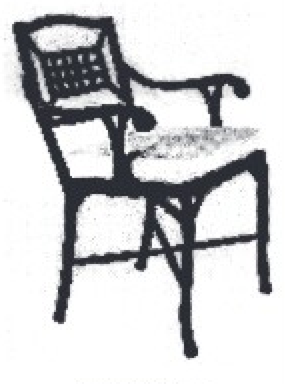
সমানুপাতিক

খ) ভারসাম্য–স্কুলে খেলার মাঠে বা পার্কে আমরা ঢেঁকিতে চড়ে খেলি। বসার পর ঢেঁকির দুদিকে যদি সমান ওজন না হয় তাহলে ঢেঁকি খেলা সম্ভব হয় না। আবার একদিকে বেশি ভারী হলে অন্যদিকে হাল্কা ওজনের দুজন বসেও খেলাটা চালিয়ে নেওয়া যায়। এটিই ভারসাম্যের নীতি। কোনো মধ্যবিন্দুর উভয় দিকে সমান দূরত্বে একই আকার আয়তনের বস্তু স্থাপন করে ভারসাম্য রাখা হয়।

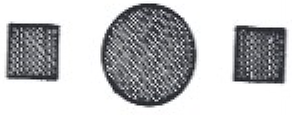
ভারসাম্য

গ) মিল–কোনো ঘরে প্রবেশ করলে যখন দেয়াল থেকে শুরু করে মেঝে, আসবাবপত্র, পর্দা, আলো ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে একটা সম্পর্ক ফুটে ওঠে, দেখতে কোনো রকম অসমন্বয় লাগে না, তখন বুঝতে হবে ঘর সাজানোতে মিল রাখা হয়েছে। এটা হতে পারে একটি জিনিসের বিভিন্ন অংশের মিল। আবার জিনিসটির সাথে অন্যান্য সকল উপকরণের মিল।

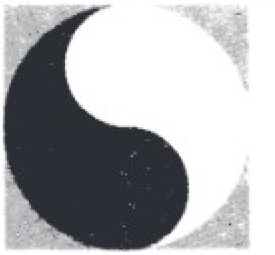

মিল

ঘ) ছন্দ–এটি একটি আকর্ষণীয় গতিশীল অবস্থা। কোনো শিল্প দেখার সময় চোখ কোনো কিছুতে যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। কোনো কিছু পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে ছন্দের সৃষ্টি হয়। শিল্পকে প্রাণবন্ত ও চলমান করতে ছন্দের দরকার হয়।

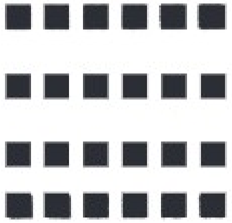

ছন্দ

ঙ) প্রাধান্য–শিল্প তৈরির সময় কোনো একটি অংশকে অন্য অংশের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটা এমনভাবে তৈরি হয় যেন একটি বিশেষ অংশের উপর আগে দৃষ্টি পড়ে। যেমন ঘরে ঢুকলে কোথাও ফুল সাজানো থাকলে সেটা আগে চোখে পড়ে। আবার ফুল সাজানোর সময় ছোট ছোট ফুলের সাথে বড় একটি গাঢ় রঙের ফুল দিয়েও প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।

প্রাধান্য

সৃজনশীল চিন্তাধারার কলাকৌশলপূর্ণ প্রকাশ হলো শিল্প। শিল্প মানুষকে আনন্দ দেয়, আকর্ষণ করে। শিল্প সৃষ্টির দক্ষতা একটি বিরাট সম্পদ যা আমাদের প্রত্যেকের মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সঠিক উপায় না জানার কারণে অনেক সময় তা কাজে লাগানো যায় না। সঠিক উপায় জেনে, মনের সৃজনশীল চিন্তাধারা কাজে লাগিয়ে যে কেউ কোনো কাজকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক করতে পারে। তবেই শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে।

কাজ ১– পাঁচটি শিল্প অনুসরণ করে পাঁচ ধরনের ছবি আঁকো। শিল্পনীতি অনুসারে ছবিগুলোর ক্যাপশন লেখো।

পাঠ ৩ – অভ্যন্তরীণ আসবাবপত্র যথাস্থানে সংস্থাপন

গৃহে আমরা নানা ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করি। খুব প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব যা প্রায় সব বাড়িতেই থাকে সেগুলো হলো খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলনা, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি। গৃহের আসবাব যথাস্থানে সংস্থাপনের উপর গৃহ পরিবেশের আরাম ও সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে।

আসবাবপত্র যথাস্থানে সংস্থাপন করা হলে আমাদের কাজ করা সহজ হয়। সময় ও শক্তির অপচয় হয় না, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি কম হয়।

এসো আমরা জেনে নেই আসবাবপত্র যথাস্থানে সংস্থাপনের জন্য কী কী বিষয় লক্ষ রাখতে হয়–

- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আসবাব কক্ষের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব হাঁটাচলায় অসুবিধা সৃষ্টি করে। ঘরে আলো ও বাতাস প্রবেশে বাধা দেয়, ঘরে খালি জায়গা কম থাকে এবং ঘরটিকে ছিমছাম মনে হয় না। এজন্যে আসবাব ক্রয়ে বা সংস্থাপনের আগে প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করা উচিত।

- প্রতিটি কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাবপত্র সাজাতে হয়। বসার ঘরে অতিথিদের জন্য বসার সোফা, চেয়ার থাকা জরুরি। সেভাবে শোবার ঘরে খাট, আলমারি, খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার সংস্থাপন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কাজের অসুবিধা করে দেখতে ভালো লাগবে চিন্তা করে আসবাব সাজানো হয়েছে। আসবাবের এরকম ত্রুটিপূর্ণ বিন্যাসে সময় ও শক্তি বেশি খরচ হয়। যেমন– পড়ার টেবিলের অনেক দূরে বইয়ের তাক।

- আসবাবপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে যেন চলাচলে অসুবিধা না হয়। আসবাবের কোনায় ধাক্কা লাগা, পায়ে হোঁচট খাওয়া ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে পরিবারে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তিদের হাঁটাচলার সুবিধা দেখতে হবে।

- যে কাজের জন্য আসবাবটি সাজানো হচ্ছে সে কাজটি যেন আরামদায়কভাবে সম্পন্ন করা যায়। উজ্জ্বল আলোর নিচে পড়ার টেবিল ও রান্নার স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। পড়ার টেবিল এমন জায়গায় থাকবে যেন যথেষ্ট আলো ও বাতাস পাওয়া যায়। কাজের স্থানে উপযুক্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকলে কাজের ইচ্ছা ও মনোযোগ বাড়ায়।

- বড় আকারের আসবাব সংস্থাপনের জন্য বড় দেয়াল প্রয়োজন। যেমন– বড় দেয়ালের সামনে আলমারি রাখতে হয়। প্রত্যেক আসবাবের সামনে ব্যবহারের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখলে ভালো হয়। দরজা, জানালা খোলার সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে আসবাব সংস্থাপন করা প্রয়োজন।

- আসবাব সংস্থাপনে শিল্পনীতি অনুসরণ করতে হবে। আসবাবের আকার আকৃতির সাথে কক্ষের আকার আকৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি। ছোট ঘরে অতিরিক্ত আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে।

- জায়গার অভাবে বর্তমানে বহুমুখী আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। একটি বহুমুখী আসবাব দিয়ে একাধিক প্রয়োজন মেটানো যায়। যেমন– সোফার পেছনের অংশ সমান করে খাট এবং নিচে ভেতরের অংশ সংরক্ষণ একক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। চিত্রে সোফার ছবি দেখানো আছে। যেহেতু বাসগৃহে জায়গার অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে তাই আসবাব সংস্থাপনে জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকে খুব বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

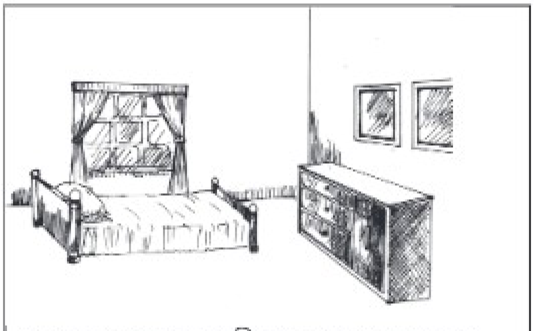
আরাম ও কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাতে হয়

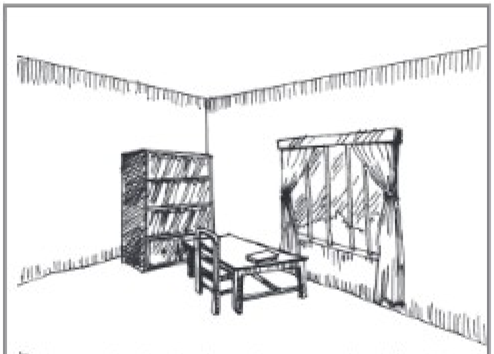
উপযুক্ত আলো-বাতাস কাজে মনোযোগ বাড়ায়

বহুমুখী আসবাব দিয়ে একাধিক প্রয়োজন মেটানো যায়

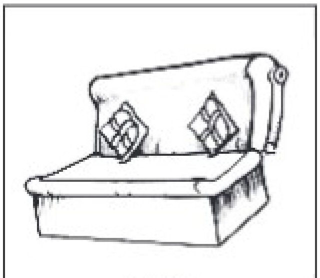
সোফা

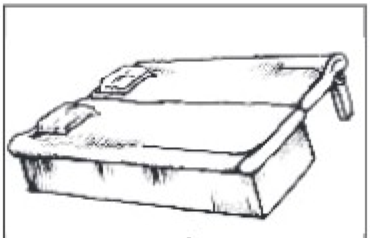
খাট

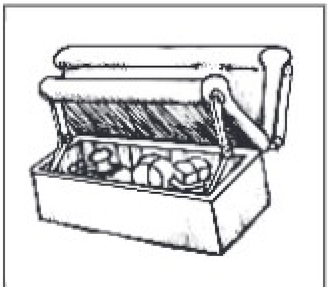
সংরক্ষণ একক

কাজ ১– আসবাব সংস্থাপনে সচরাচর যে ত্রুটিগুলো চোখে পড়ে তার তালিকা করো।
কাজ ২– আসবাব সংস্থাপনে তুমি কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে? গুরুত্ব অনুসারে সাজাও।

পাঠ ৪ – কক্ষসজ্জার উপকরণ

আসবাবপত্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়ে আমরা ঘর সাজিয়ে থাকি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দরজা ও জানালার পর্দা, কার্পেট, দেয়ালচিত্র, আলো এবং ফুলের বিন্যাস।

দরজা ও জানালার পর্দা

গৃহে দরজা ও জানালার পর্দার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথমত, পর্দার ব্যবহার আমাদের আব্রু রক্ষা করে। বিশেষ করে পর্দার ব্যবহারে রাতের আলোতে ঘরের ভেতরের কর্মকাণ্ড, চলাফেরা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কড়া রোদ, বাইরের ধুলাবালি থেকে অনেক সময় ঘরকে ঢাকার প্রয়োজন হলেও পর্দা ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত রং, আকার, নকশার পর্দা নির্বাচন করতে পারলে ঘরের পরিবেশকে অনেক আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক করা সম্ভব।

ঘরে আলো আসার উপযোগী পর্দা

পাট, টুকরা কাপড়, দেশীয় নানা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি পর্দা

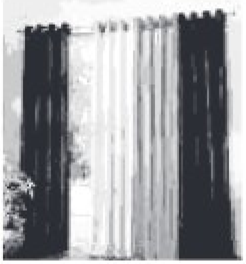

পর্দায় বিভিন্ন রং

জানালার অর্ধেক অংশে পর্দা

পর্দা নির্বাচনে লক্ষণীয় বিষয়

ঘরের দেয়াল, মেঝে, ছাদ ও আসবাবপত্রের রঙের সাথে মিল রেখে পর্দার রং নির্বাচন করতে হয়। বর্তমানে ঘরের আকার ছোট হয় বলে হাল্কা রঙের পর্দা ব্যবহারে ঘরকে বড় দেখায়। হাল্কা রঙের পর্দা বিশ্রামের ঘরগুলোতে ঠান্ডা পরিবেশ সৃষ্টি করে। বড় ছাপা, চেক, আড়াআড়ি রেখার পর্দা বড় আকারের ঘরে ব্যবহার করা যেতে পারে। ছোট আকারের ঘরে ছোট ছাপা, লম্বা রেখার পর্দা ব্যবহার করা ভালো। চেক, ছাপার পর্দা ছোট আকৃতির ঘরকে আরও ছোট করে দেয়।

পর্দার কাপড়ের জমিন হাল্কা বা ভারী উভয় ধরনের হতে পারে। এর জন্য কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক তন্তুর কাপড় নির্বাচন করা যেতে পারে। ভারী জমিনের পর্দা শীতকালে ঘর গরম রাখে। পর্দা বিভিন্ন নকশার হয়। সজ্জামূলক নকশার পর্দা আমরা বসার ঘরে ব্যবহার করি। জানালার পর্দা অনেক সময় জানালা জুড়ে না হয়ে নিচের অর্ধেক অংশে দেওয়া হয়। এতে বেশি আলো ও বাতাস পাওয়া যায়। একই ঘরে খাবার ও বসার ব্যবস্থা পৃথক করার জন্য পর্দা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পাটের বিভিন্ন দড়ি, রং-বেরঙের কাপড় ঝুলিয়ে পর্দার আবহ আনা যায়।

কার্পেট

আমাদের দেশে ঘরের মেঝে বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন– মাটির ও সিমেন্টের মেঝে, মোজাইক মেঝে, টাইলস মেঝে, কাঠের মেঝে ইত্যাদি। বর্তমানে টাইলস মেঝে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিভিন্ন রং ও নকশায় তৈরি টাইলস মেঝে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়, মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে ঘরের পরিবেশকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করা যায়।

ঘরের সম্পূর্ণ মেঝেতে কার্পেট বিছানো যায়। আবার মেঝের কিছু অংশজুড়ে ছোট কার্পেট দেওয়া যেতে পারে। পুরাতন বাড়ির মেঝে কিংবা সাধারণ সিমেন্টের মেঝেতে যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে কার্পেট দিয়ে সেটা ঢেকে রাখা যায়। কৃত্রিম তন্তুর কার্পেট যেমন– নাইলন, পলিস্টার এর রং ও উজ্জ্বলতার স্থায়িত্ব বেশি এবং দামে সস্তা হয়। এ ধরনের কার্পেটে ধুলাবালি কম জমে, সহজে পরিষ্কার করা যায়। প্রাকৃতিক তন্তুর কার্পেট (যেমন–উল, পাট, সুতি)–এর মধ্যে উলের কার্পেটে হাঁটতে আরাম এবং শিশুর জন্য কিছুটা নিরাপদ। কার্পেট নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। তা না হলে ধুলাবালিজনিত রোগ, যেমন– শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে।

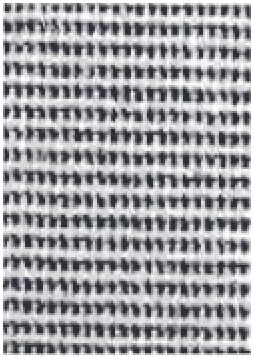	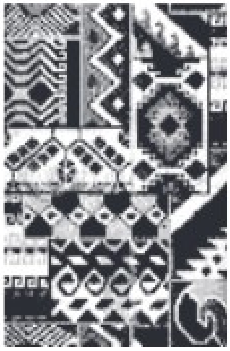	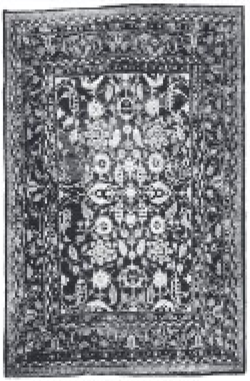	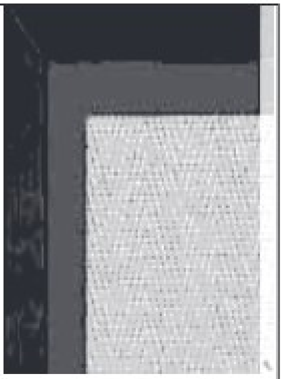
জুট কার্পেট	জামদানি নকশায় কার্পেট	কৃত্রিম তন্তুর কার্পেট	সাধারণ নকশার কার্পেট

কাজ ১–তোমার পরিবারে বসার ঘরের জন্য পর্দা ও কার্পেট ক্রয় করতে হবে। পর্দার জন্য তুমি কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে? কার্পেট নির্বাচনের জন্য তুমি কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে?

দেয়ালচিত্র ও আলোক সজ্জা

দেয়ালচিত্র

কক্ষসজ্জার অন্যতম একটি উপকরণ হলো দেয়ালচিত্র। দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে দেয়ালে নানা ধরনের পেইন্টিং এবং ছবি ঝোলানো হয়। দেয়ালচিত্র কোথায় টাঙানো হবে তার জন্য স্থান নির্বাচন এবং উপযুক্ত ছবি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তবে আরও কিছু লক্ষণীয় বিষয় হলো–

- ছবির আকৃতির সাথে দেয়ালের আকৃতির সামঞ্জস্য থাকতে হবে। বড় ছবির জন্য বড় দেয়াল উপযোগী।
- একের অধিক ছবি দিয়েও বড় দেয়াল সাজানো যায়। সেক্ষেত্রে ছবির ফ্রেমের আকার এক রকম হলে ভালো হয়। তবে খুব বেশিসংখ্যক ছবি বা অনেক ছোট ছোট ছবি এক দেয়ালে ভালো দেখায় না।
- ঘরের সব ছবি একই উচ্চতায় টাঙাতে হবে। এটা চোখ বরাবর হলে দেখতে সুবিধা হয়।
- ঘরের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রেখে ছবির বিষয়বস্তু হবে। যেমন– খাবার ঘরে খাবারের ছবি উপযুক্ত।
- দেয়ালে ছবি এমনভাবে টাঙাতে হবে যাতে কোনো তার, দড়ি, সুতা দৃষ্টিগোচর না হয়।
- ছবি দেখার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে।

দেয়ালচিত্র ছাড়াও হাতে তৈরি নানা ধরনের শিল্প দিয়ে দেয়াল সাজানো যায়। দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজের হাতে তৈরি যেকোনো দেয়ালসজ্জা গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে পাট, ঝিনুক, পাখির পালক, শুকনা ডালপাতা, ফলের বীজ, ধানের শিষ ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার কাপড়, সুতা, রং, ধাতবসামগ্রী, বোতাম, শব্দ তৈরি হয় এমন বস্তু দিয়েও

দেয়ালসজ্জা তৈরি করা যায়। গৃহের যেকোনো সজ্জার মধ্যে দিয়ে দেশিয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে পারলে তা সবার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য ও পছন্দের হয়।

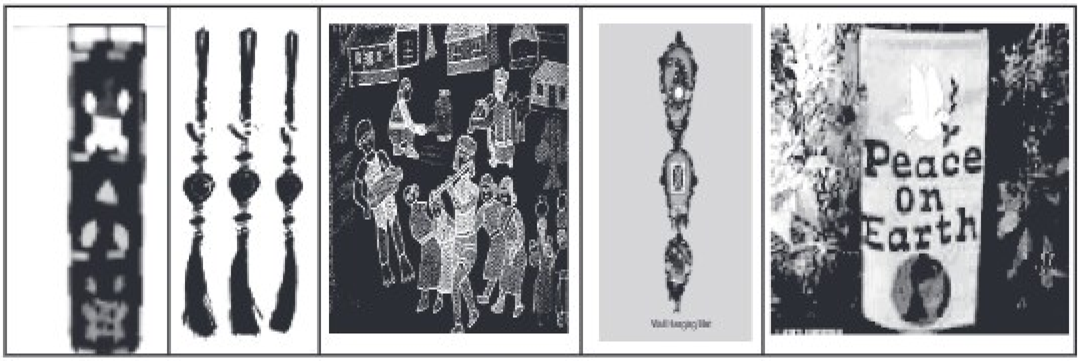

বিভিন্ন ধরনের দেয়ালচিত্র ও দেয়ালসজ্জা

কাজ ১– দেশীয় উপকরণ এবং ভাববস্তু (theme) ব্যবহার করে একটি দেয়ালসজ্জা তৈরি করো।

আলোকসজ্জা ও আলোর সুষ্ঠু ব্যবহার

আলো ছাড়া আমরা চলতে পারি না। আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য এই আলোর উৎস কী? সূর্য থেকে আমরা প্রাকৃতিক আলো পাই। রাতের বেলা প্রাকৃতিক আলো থাকে না। তখন কৃত্রিম আলো দিয়ে আমাদের চলতে হয়।

তোমরা কি লক্ষ করেছ যে, রৌদ্রোজ্জ্বল বা মেঘলা দিনে আমাদের মন কেমন থাকে? রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কাজ করার ইচ্ছা জাগে, আমরা বাইরে বের হই। অপরদিকে মেঘলা দিনে মনে কিছুটা বিষণ্ণতা আসে, অলসভাবে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। এভাবে আলো আমাদের শরীর ও মনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। গৃহে প্রাকৃতিক আলো আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায়, উপযুক্ত আলোয় পড়াশোনায় মনোযোগ আসে, শীতকালে ঘরে আলো এলে ঘর গরম থাকে।

ঘরে প্রাকৃতিক আলো আসার ব্যবস্থা করা কাজের জন্য ভালো ও স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ঘরে প্রবেশের জন্য আজকাল জানালা, দরজায় গ্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমাদের দেশে দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে আলোর প্রাপ্তি ও বায়ুপ্রবাহ বেশি হয়। শীতকাল ছাড়া বছরের প্রায় সব সময় দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বায়ুপ্রবাহ হয়। তাই গৃহের দক্ষিণ ও পূর্বের জানালা খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনোই আসবাবপত্র দিয়ে আলো ও বাতাস বন্ধ করা যাবে না। জানালার আকার, সংখ্যা, অবস্থান ইত্যাদির ওপর ঘরে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশ নির্ভর করে। এছাড়া পর্দার জমিন, রং, ডিজাইন বা নক্শার উপর

বিভিন্ন রং ও নকশার শেড ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়

কক্ষের সুষ্ঠু প্রাকৃতিক আলোর প্রবেশ নির্ভর করে।

রাতে আমরা কৃত্রিম আলো ব্যবহার করি। প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। যেমন– রান্নাঘরে রান্নার স্থানে, পড়ার টেবিলের উপর উজ্জ্বল আলোর দরকার। বসার ঘরে মৃদু আলো ঘরকে আকর্ষণীয় করে তোলে। শোবার ঘরের আলো স্নিগ্ধ হতে হয়। অনেক সময় কৃত্রিম আলোর বাল্বের উপর শেড ব্যবহার করা হয়। সেগুলোর রং ও নকশা নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্ক হতে হয়। বিভিন্ন রং ও নকশার শেড ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়, সুরুচির পরিচয় বহন করে।

কাজ ১– কক্ষে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের জন্য তুমি কী কী বিষয় লক্ষ রাখবে? তা লেখো।

পুষ্পবিন্যাস

ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ কি খুঁজে পাওয়া যাবে? নিশ্চয়ই না। আমাদের পছন্দের এই ফুল ও পাতার বিন্যাস কক্ষ সজ্জার অন্যতম অংশ। ফুলদানিতে যদি ফুল ও পাতা থাকে, তবে ঘরের সৌন্দর্য শতগুণ বেড়ে যায়। বাড়িতে ফুল দিয়ে সাজানো কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করে, সদস্যদের সুরুচির পরিচয় দেয়। এছাড়া গৃহসজ্জায় আমরা নানা কারণে ফুলের বিন্যাস করি –

- বিশেষ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করার জন্য ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়। যেমন– বিয়ে, হলুদের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদি।
- এটা কক্ষসজ্জায় একঘেয়েমি দূর করে।
- কম খরচে গৃহকে আকর্ষণীয় করা যায়।
- ফুল ও পাতা দিয়ে সাজানোর কারণে ঘরে কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাদ পাওয়া যায়।
- ঘরে ফুলদানিতে ফুল থাকলে সবার দৃষ্টি প্রথমেই সেদিকে যায় অর্থাৎ কক্ষসজ্জায় খুব সহজেই প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।
- মনকে ভালো রাখার জন্যে আমরা ফুল সাজাই।
- বাড়িতে অতিথি এলে ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়।

ফুল সাজানোর জন্য বিশেষ কিছু সরঞ্জামের দরকার হয়। যেমন– ফুলদানি বা ফুল সাজানোর পাত্র, কাঁচি, পিন হোল্ডার, পানি, চিকন তার ইত্যাদি।

ফুল সাজানোর সময় প্রথমেই উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ফুল সাজানোর পদ্ধতি আলাদা হয়ে থাকে যেমন– কোনো উৎসবে ফুল সাজানো এবং প্রতিদিনের ফুল সাজানো এক হয় না। সাধারণত প্রাচ্যরীতি এবং পাশ্চাত্যরীতি অনুসরণ করে ফুল সাজানো হয়। প্রাচ্য রীতিতে ফুল সাজানো বলতে জাপানি পদ্ধতি অনুসরণ করাকে বোঝায়। জাপানিরা ফুল সাজানোতে খুব দক্ষ। তাদের ফুল সাজাবার পদ্ধতিকে ইকেবানা (IKEBANA) বলা হয়। ইকে অর্থ তাজা, বানা অর্থ ফুলকে বোঝায়। এই রীতিতে অল্পসংখ্যক ফুলের দরকার হয়। এই পদ্ধতিতে ফুলদানিতে তিনটি প্রধান ডাল থাকে। সবচেয়ে

উঁচু ডালটি হলো স্বর্গ, দ্বিতীয় উচ্চতার ডালটি মানুষ এবং ছোট ডালটি পৃথিবীর প্রতীক হিসাবে ফুল সাজানো হয়।

প্রথম ডালটির উচ্চতা ফুলদানির ব্যাস ও উচ্চতার যোগফলের সমান। দ্বিতীয় ডালটি প্রথম ডালের ৩/৪ অংশ (৪ ভাগের ৩ ভাগ)। ছোট ডালটি দ্বিতীয় ডালের ১/২ অংশ (অর্ধেক)। প্রধান ডাল তিনটি ছাড়া আশপাশের ডাল, পাতা, ফুলকে ফিলার বলা হয়। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ফুল সাজানোতে অনেক ফুল ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্তূপাকারে ফুল সাজানো হয়। জাঁকজমকপূর্ণ ফুলদানিতে বিভিন্ন রঙের ফুল এক সাথে সাজানো হয়।

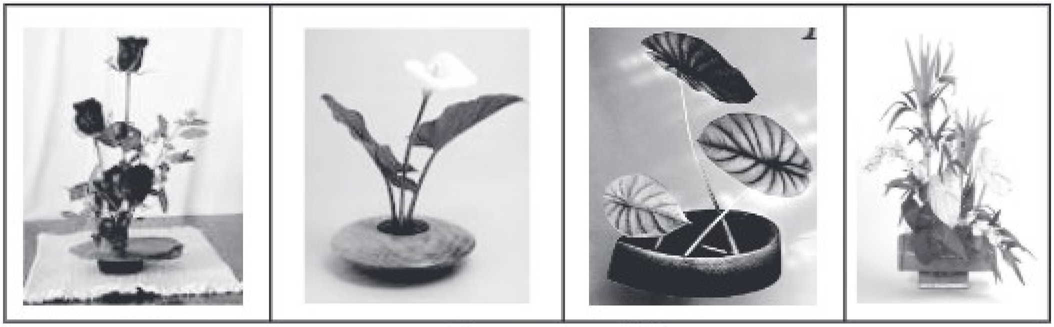

পুষ্পবিন্যাস– প্রাচ্য রীতি

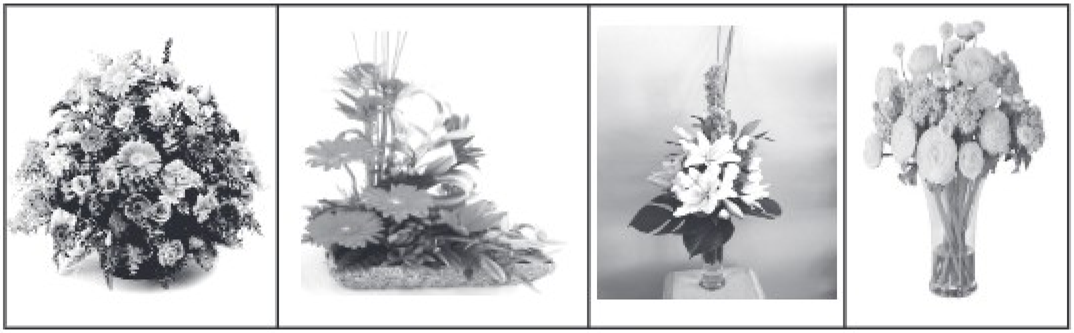

পুষ্পবিন্যাস– পাশ্চাত্য রীতি

যে রীতিতেই আমরা ফুল সাজাই না কেন, আমাদের ফুল সাজানোর সময় কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে–

- ফুলদানির আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফুল, ডাল, পাতার উচ্চতা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে।
- ঘরের আসবাব, পর্দা, কার্পেটের সাথে ফুলের রং যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- কখনই তাজা ফুলের মধ্যে কৃত্রিম ফুল মেশানো উচিত না।
- পিন হোল্ডারটি যেন পানিতে ডুবে থাকে।
- শুকনা, পোকা খাওয়া পাতা, কোঁকড়ানো পাতা ও ফুল ফেলে দিতে হয়।

তাজা ফুলের পরিবর্তে কাপড়, কাগজ ও প্লাস্টিকের ফুল দিয়েও ফুলদানি সাজানো যায়। এসব ফুল দিয়ে একবার ফুলদানি সাজালে তা অনেক দিন ধরে রাখা যায়। এতে সময় ও শক্তি বাঁচে। কিন্তু এসব ফুলের আবেদন তাজা ফুলের মতো হয় না। তাজা, টাটকা ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য আমাদেরকে বেশি আকৃষ্ট করে।

কাজ ১– শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফুল সাজাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. **নিচের কোনটি প্রাথমিক রং?**

ক. কমলা খ. লাল
গ. বেগুনি ঘ. সবুজ

২. **কোন রেখা অধিক বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম?**

ক. জিগজ্যাগ রেখা খ. কৌণিক রেখা
গ. লম্ব রেখা ঘ. বক্ররেখা

৩. **কাজে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য গৃহে প্রয়োজন–**

i. দামি আসবাবপত্র
ii. সুসজ্জিত কক্ষ
iii. উপযুক্ত আলো বাতাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. সালেহা ও হালিমা একই আয়তনের ফ্ল্যাটে থাকেন। সালেহা তাঁর বসার ঘরে আকাশি রঙের পর্দা ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে হালিমা তাঁর বসার ঘরে লাল রঙের ফুলের ছাপার পর্দা ব্যবহার করেছেন এবং দরজার পাশে বড় আকারের একটি মাটির টব রেখেছেন। পাশের ফ্ল্যাটের মারিয়া একদিন সালেহার বাসায় বেড়ানো শেষে হালিমার বাসায় এসে বললেন, তোমার বসার ঘরটি একটু বড় হলে ভালো হতো।

ক. আলোর উৎস কী?
খ. অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জা বলতে কী বোঝায়?
গ. সালেহা গৃহসজ্জায় কোনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. গৃহসজ্জায় হালিমার পারদর্শিতা বিশ্লেষণ করো।

খ বিভাগ

শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক

শিশুদের উপযুক্ত বিকাশের জন্য উন্নত পারিবারিক পরিবেশ প্রয়োজন। এর পাশাপাশি প্রয়োজন উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ। শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলাধুলার পাশাপাশি শখ ও বিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবন্ধী শিশুরা আমাদের সমাজেরই একজন। তাই এদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানা জরুরি। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকারগুলো জানাও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। একটি শিশুকে পরিবার ও সমাজের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

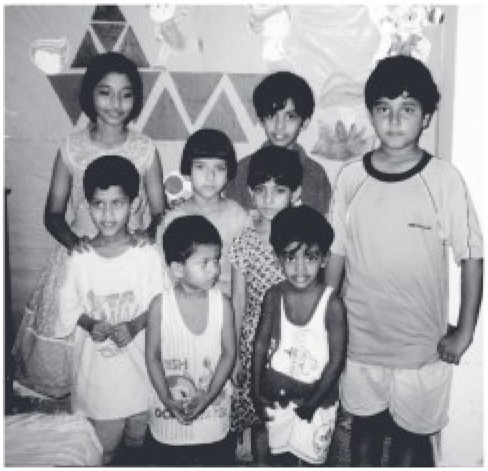

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পরিবার ও সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিশুর বিকাশে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারব।
- শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলাধুলার শখ ও বিনোদনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রকারভেদ এবং তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকারগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঝুঁকি পূর্ণ শিশুশ্রম ও শিশুপাচার প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে শিশু

পাঠ ১– পরিবার ও সমাজে শিশু

আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারে বাস করি। একটি বাড়িতে সাধারণত মাবাবা, ভাইবোন আরও অন্যান্য সদস্য একসাথে থাকার যে প্রতিষ্ঠান সেটি হলো পরিবার। সন্তানেরা শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছায়। সন্তানদের বিয়ের মাধ্যমে আরও কয়েকটি পরিবার তৈরি হয়। এভাবে পরিবারের জীবনচক্র চলতে থাকে।

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানবশিশু সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে থাকে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। শিশু খুব ধীরে ধীরে বড় হয়। তার আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বছরের পর বছর সহায়তা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দরকার হয়। পরিবার এ দায়িত্ব পালন করে। পরিবার শিশুর আশ্রয়। জন্মের পর থেকে সমবয়সিদের সাথে মেলামেশার পূর্ব পর্যন্ত শিশুটিকে পরিবারই সঙ্গ দিয়ে থাকে।

জন্মের পর পরিবারের সাথে শিশুর একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। বড় হওয়ার সাথে সাথে এই সম্পর্ক পরিবর্তন হতে থাকে। সে নিজের কাজ নিজে করতে পারে, নিজের মতামত দিতে পারে, পরিবারের ছোটখাটো কাজে অংশ নিতে পারে। পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শিশুরা পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে যায়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যে যতো বেশি একে অন্যের সহযোগিতা করে, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে, দুঃখকষ্ট ভাগাভাগি করতে পারে, বন্ধুভাবাপন্ন হয়, পরিবারের কাজে অংশ নেয় সে তত পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে পারে।

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক। কয়েকটি পরিবার নিয়ে হয় একটি সমাজ। আদিম যুগে যখন পরিবার প্রথা ছিল না তখনো মানুষকে খাবার জোগাড় করতে হতো, হিংস্র প্রাণী থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হতো, এ রকম ভয়ানক বিপদ ও কষ্টের মধ্যে মানুষ নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য দল বেঁধে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এভাবে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দলবেঁধে থাকতে শুরু করে এবং সমাজ জীবনের শুরু হয়।

শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক

পরিবার শিশুটির খাদ্য, বস্ত্র, আরামের চাহিদা মেটায়, নিরাপদ পরিবেশ দেয়, নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। শিশুটির এই প্রয়োজন মেটাতে খাদ্যশস্যের জন্য কৃষক, কাপড়ের জন্য তাঁতি, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, শিক্ষার জন্য শিক্ষক এভাবে সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ পরিবারটির সাহায্যে এগিয়ে আসে। সমাজের এই সহযোগিতা ছাড়া পরিবারের একার পক্ষে চলা সম্ভব হয় না। এভাবে পরিবার ও সমাজ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। শিশু যেমন পরিবারের একজন সদস্য, তেমনি সমাজেরও একজন সদস্য।

শিশুর স্বাস্থ্য সেবায় সামাজিক সহায়তা

বর্তমানে আমাদের চাহিদা অনেক বেশি ও বহুমুখী। পরিবারকে সহায়তার জন্য অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা ও আচরণের জন্য স্কুল ও কলেজ, স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতাল, সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য আইন-আদালত, পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।যদিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিবারকে অনেক কাজে নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছে, তবু শিশুদের জন্য প্রাথমিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিবারকেই গ্রহণ করতে হয়। যেমন– শিশুর স্বাস্থ্য, আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি দেওয়া, গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণ শেখানো ইত্যাদি।

প্রত্যেক সমাজে কিছু নিয়মনীতি থাকে। পরিবার সমাজের এসব নিয়মনীতি অনুযায়ী শিশুকে আচরণ করতে শেখায়। সবার সাথে ভালো ব্যবহার, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা, সহযোগিতা করা ইত্যাদি আচরণ সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে ঝগড়া, মারামারি করা, খারাপ ব্যবহার, পরিবেশ নোংরা করা, অন্যের সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি আচরণ সমাজ আশা করে না। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য আচরণ নিয়ে শিশু বেড়ে উঠলে সমাজ ও দেশের উন্নতি হয়। এভাবে প্রতিটি শিশু পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

কাজ ১–পরিবারের সদস্য হিসেবে তোমার কী ধরনের দায়িত্ব পালন করা উচিত তা লেখো।
কাজ ২–তুমি কী গুণাগুণ নিয়ে বেড়ে উঠলে সমাজের উপকারে আসতে পার তা লেখো।

পাঠ ২ – পারিবারিক পরিবেশের ভূমিকা

মানুষের সুস্থ বিকাশের জন্য উন্নত পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব অনেক।

যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে আমরা কোনো পরিবারকে উন্নত পরিবেশের অধিকারী বলতে পারি তা হলো –

- যে পরিবারে প্রত্যেক সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক থাকে। সেখানে যেকোনো অভিজ্ঞতা বা সমস্যা একে অপরের সাথে আলোচনা করা যায়, একে অন্যের বিপদে ভালো পরামর্শ দেয়, সহযোগিতা করে এবং ঝগড়াঝাঁটি হয় না।
- যে পরিবারে শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে, খেলাধুলার সুযোগ থাকে, বড় সদস্যরা ছোট শিশুর সাথে খেলাধুলায় অংশ নেয়, শিশুদেরকে গান, গল্প, ছড়া শোনায়, কৌতূহল মেটানোর জন্য বাইরের পরিবেশে নিয়ে যায়, শিশুর বিভিন্ন প্রশ্নে বিরক্ত না হয়ে যেভাবে সম্ভব বুঝিয়ে দেয়া হয়।
- যে পরিবারে শিশুকে প্রশংসা করা হয়, শিশুর বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।

- যে পরিবারে অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশায় সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং যে পরিবারে বয়স্কদের সাথে শিশুর সাক্ষাতের সুযোগ থাকে।
- যে পরিবারে শিশুর সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিশু পরিচালনা নীতি অনুসরণ করা হয়।

জীবনের প্রথম ৫ বছর পরিবার থেকে শিশু যেরকম শিক্ষা, যত্ন পেয়ে থাকে তার মধ্যে সেরকম আচরণের ভিত্তি তৈরি হয়। মা, বাবা এবং পরিবারের সদস্যারা শিশুর প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। তারা শিশুর সবরকম ভালো অভ্যাস তৈরিতে সহায়তা করেন। পারিবারিক পরিবেশ থেকে যদি শিশু ভালো কাজের জন্য উৎসাহ পায় তাহলে সেটা তাড়াতাড়ি শেখে। যে কাজ করলে সকলে অপছন্দ করে সেটা খারাপ কাজ বলে ধারণা লাভ করে। পরিবার থেকে তাদের ভালো এবং মন্দ কাজের অভ্যাস তৈরি হয়।

পরিবার যখন শিশুকে বাড়ির বাইরের পরিবেশে নিয়ে যায়, তাদের বিভিন্ন কৌতূহল মেটায়, সমবয়সিদের সাথে খেলার সুযোগ করে দেয়, শিশুরা তখন সহজেই সকলের সাথে মেলামেশা করার ক্ষমতা অর্জন করে। শিশুকে যখন গান, গল্প, ছড়া শোনানো হয় তখন শিশুর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, স্মরণশক্তি, মনোযোগ ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। সমবয়সিদের সাথে মেলামেশার ফলে শিশু সহযোগিতা ও গ্রহণযোগ্য সামাজিক আচরণ করতে শেখে। বড়দের সাথে মেলামেশায় শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

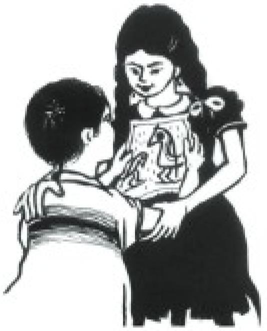

যেকোনো কাজে উৎসাহ ও প্রশংসা শিশুর দক্ষতা বাড়ায়

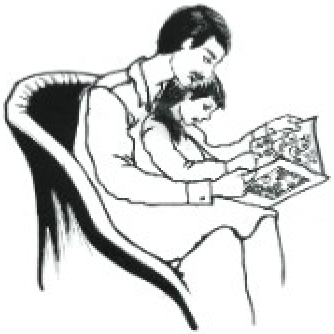

মা-বাবার সঙ্গ শিশুকে অধিক নিরাপত্তা দেয়

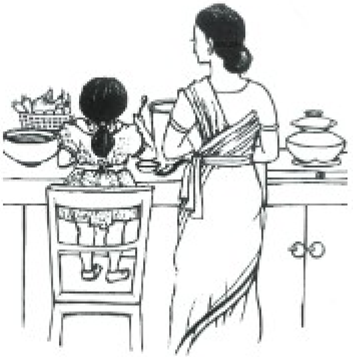

পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণে শিশু নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাবে

শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনার অন্যতম কৌশল হলো শিশুর সাথে ইতিবাচক আচরণ করা। শিশুকে সব সময় এটা কোরো না, ওটা কোরো না, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না এ ধরনের নেতিবাচক কথা শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এসো আমরা এ কাজটা করি, তুমি এখন পারছো না, তাতে কী? চেস্টা করলেই পারবে, তুমি এটা করলে আমরা সবাই তোমাকে অনেক ভালো বলবো, এ ধরনের প্রতিটি কথা শিশুর বিকাশের জন্য ইতিবাচক।

শিশুরা তাদের আবেগ তীব্রভাবে প্রকাশ করে। অল্পতেই সে চিৎকার করে কাঁদে, ভয় পায়, রেগে যায়। শিশুর রাগ, ভয়, কস্টে অবহেলা না করে সহানুভূতির সাথে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করলে শিশু সুখী হয়। পরিবারের সঠিক পরিচালনায় একটি শিশু পরিবার ও সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত সদস্য

হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। মা-বাবা, ভাইবোনের সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকে বলে পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশু বিভিন্ন আচরণের কৌশল শেখে।

কাজ ১– শিশু পরিচালনায় কিছু নেতিবাচক উক্তি ও ইতিবাচক উক্তির তালিকা করো।
কাজ ২– উন্নত পারিবারিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

পাঠ ৩ – শিশুর বিকাশে পরিবারের ভূমিকা

শিশু খুব অসহায় ও পরনির্ভরশীল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে, আনন্দে হাসতে পারে, অন্যকে সাহায্য করতে পারে। ওপরের আচরণগুলো প্রত্যেক শিশুর বিভিন্ন ধরনের বর্ধন ও বিকাশ। বিকাশ অর্থ গুণগত পরিবর্তন এবং বর্ধন হচ্ছে পরিমানগত পরিবর্তন যা শিশু ধীরে ধীরে অর্জন করে। এই পরিবর্তন প্রধানত শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা মানসিক, আবেগীয় ও সামাজিক হয়ে থাকে।

১। **শারীরিক বিকাশ (Physical Development)**– এর মধ্যে পড়ে দেহের আকৃতি, অনুপাত, চেহারা, শরীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন– হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি), ইন্দ্রিয় ও সঞ্চালন দক্ষতা (দেখা, শোনা, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ), হাঁটা, দৌড়ানো, শারীরিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

২। **মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হলো (Cognitive Development)**– বুদ্ধিগত দক্ষতার পরিবর্তন। এর মধ্যে পড়ে মনোযোগ, স্মরণশক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাত্যহিক জীবনের জ্ঞান, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা, ভাষার দক্ষতা, যুক্তি দিয়ে বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি।

৩। **আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ (Emotional and Social Development)**–ক্রোধ বা রাগ, ভয়, উদ্বেগ, হিংসা, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদিতে যে আলোড়িত অবস্থা হয় তা হচ্ছে আবেগীয় বিকাশ। বিভিন্ন অনুকূল সামাজিক বিকাশের মধ্যে পড়ে সহযোগিতা, সমবেদনা, অংশগ্রহণ, পরোপকার, নিঃস্বার্থ হওয়া। অসামাজিক আচরণ হলো আক্রমণাত্মক আচরণ, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ধ্বংসাত্মক আচরণ ইত্যাদি।

শারীরিক বিকাশ

বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ

শিশুর সব ধরনের বিকাশে প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্র হলো পরিবার। শিশুর বিকাশে অন্য যে বিষয়গুলো প্রভাবিত করে সেগুলোর কোনোটিই পরিবারের সমতুল্য নয়। পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এটা সারা জীবনের জন্য তৈরি হয়।

মা-বাবার ভূমিকা

শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তুলতে মা হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে মা ও সন্তানের সম্পর্কের শুরু হয়। মায়ের হাসি, মায়ের কণ্ঠস্বর শিশুর মধ্যে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মায়ের সাথে যোগাযোগের জন্য সন্তানের জন্মগত চাহিদা থাকে। মা সন্তানের যত্ন আনন্দের সাথে সম্পন্ন করেন যা সন্তানের সুস্থ বিকাশে সহায়ক।

শিশুদের লালনপালনে ও যত্নে মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব পরিবারে বাবা শিশুকে সঙ্গ দেন, ভাব বিনিময় করেন, সেখানে শিশুরা নিজেদেরকে বেশি নিরাপদ মনে করে। তাদের মধ্যে সামাজিক ও আচরণগত সমস্যা কম হয়। বাবা-মায়ের পর্যাপ্ত স্নেহের অভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের ক্ষতি হয়। বয়সানুযায়ী ওজন বাড়ে না, কাজে আগ্রহ হারায়, তাদের চেহারা মলিন ও বিমর্ষ থাকে।

ভাই ও বোনের ভূমিকা

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। পরিবারের অন্য সদস্যরা বিশেষ করে বড় ভাইবোন শিশুর সামনে যে ধরনের আচরণ করে শিশুটিও সে ধরনের আচরণ শেখে। ভাইবোনের সাথে সম্পর্ক শিশুর বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভাইবোনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলে একজন অপরজনকে সঙ্গ দেয়, ভাগাভাগি করতে শেখে, যেকোনো সমস্যার কথা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে। এভাবে সে জীবনের যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে সহজেই খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে ভাইবোন ঈর্ষা, একজন অন্যজন অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করা, একে অন্যকে ঘৃণা করা ইত্যাদি মনোভাব পরিবারে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি আনে। তাদের মধ্যে আক্রমণধর্মী আচরণ, ঝগড়া করার প্রবণতা বেড়ে যায়। একজনের প্রয়োজনে অন্যজন এগিয়ে আসে না। এরকম পরিস্থিতিতে উভয়ের মন খারাপ থাকে, তাদের সময়টা আনন্দে কাটে না।

কাজ ১– পরিবারে ভাইবোনেরা একে অন্যকে কোন বিষয়ে কীভাবে সাহায্য করবে তার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

পাঠ ৪– শিশুর বিকাশে সমাজের ভূমিকা

পরিবারের পর আর কোন চালিকাশক্তি শৈশব ও কৈশোরের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? উত্তরটি খুবই স্পষ্ট। সেটি হলো সমবয়সি দল। বিদ্যালয় বয়স থেকে শিশুরা বড় একটা সময় সমবয়সিদের সাথে কাটায়। তারা শ্রেণিকক্ষে থাকে, পড়াশোনার বাইরে নানারকম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, প্রচারমাধ্যম যেমন–রেডিও, টিভি, কম্পিউটার সম্পর্কে নানারকম আলাপ আলোচনা তারা বন্ধুদের সাথে করে। তারা অগণিত খেলা বন্ধুদের সাথে খেলে।

এ বয়সে শুধু পরিবারের সাথে সময় কাটানো তাদের সন্তুষ্টি আনতে পারে না। মা-বাবা এবং সমবয়সি দল একে অন্যের পরিপূরক হয়। মা-বাবার স্নেহ নির্দেশনা শিশুদের নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। কিন্তু সামাজিক বিভিন্ন দক্ষতার জন্য সমবয়সিদের সাথে মেলামেশার দরকার হয়। যেমন– একে অন্যকে সাহায্য করা, মতামত ও ধারণা আদানপ্রদান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখা ইত্যাদি। তারা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একে অন্যকে সাহায্য করে থাকে।

খেলার মাঠে খেলার সঙ্গীদের সাথে শিশুরা দলীয় খেলায় অংশ নেয়। দলীয় খেলায় তারা দক্ষতা অর্জন করে যেমন – ভাষার বিকাশে দক্ষতা আসে, পরিকল্পনা করতে শেখে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হয়, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে যে ভালো ফল করা যায় এ ধারণা পায়।

দলের প্রভাবে অনেক সময় খারাপ আচরণের অভ্যাস হয়ে থাকে। সমবয়সিরা প্রাধান্য বিস্তার করলে মা–বাবার সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হয়। ছেলেমেয়েরা বাড়ির কাজ, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এ থেকেই মা-বাবার সাথে কলহের সূত্রপাত হয়।

কৈশোরের সমবয়সি দল
পরিবারের পরই বিকাশের মূল চালিকাশক্তি

স্কুল – শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে স্কুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান বিতরণ করা হয়। এই কাজে মুখ্য ভূমিকা রাখেন স্কুলের শিক্ষকেরা। তারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি করেন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করেন। এ সকল বিকাশে শিক্ষকেরা যেভাবে ভূমিকা রাখেন–

- পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেন।
- শিক্ষকেরা ভালো আচরণে উৎসাহিত করেন, খারাপ আচরণের ফলাফল বুঝিয়ে সতর্ক করেন।
- শিক্ষকের প্রশংসা শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অংশগ্রহণ বাড়ায়, ভালো ফল করতে উৎসাহী করে এবং স্কুলের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে।
- পছন্দের শিক্ষকের অনুকরণে শিক্ষার্থীরা আচরণ শেখে ও জীবনের লক্ষ্য স্থির করে।

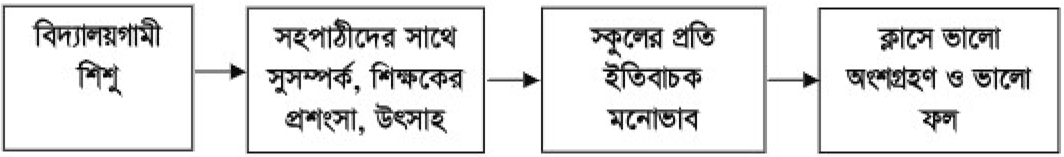
বিদ্যালয়গামী শিশু
সহপাঠীদের সাথে সুসম্পর্ক, শিক্ষকের প্রশংসা, উৎসাহ
স্কুলের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব
ক্লাসে ভালো অংশগ্রহণ ও ভালো ফল

শিশুরা সব সময় উৎসাহ পেতে চায়। অনেক সময় শিক্ষকের দেওয়া শারীরিক শাস্তি বা শাস্তির ভয় দেখানো শিশুর বিকাশের জন্য ক্ষতিকর হয়। এতে শিশুর মনে ভয় হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষককে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না এবং মানসিক চাপ বাড়ে যা মস্তিষ্ক গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন

প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্য ছাড়া পরিবারের একার পক্ষে চলা খুব কঠিন। নানা ধরনের সহযোগিতার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য শিশুর বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়, যেমন– পরিবারে মা কিংবা বাবার মৃত্যু, অসুস্থতা, যেকোনো মতবিরোধ বা পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়ান। এসব বিপর্যয়ে শিশু সন্তানদের স্নেহ, ভালোবাসা, উপদেশ ও পরামর্শের প্রয়োজন হয়। নির্ভর করা যায় এমন প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সাথে সন্তানেরা খোলামেলা আলোচনা করতে পারে। এতে তাদের বিশেষ করে কৈশোরের ছেলেমেয়েদের হতাশা কম হয়, তারা বিপদকে মোকাবেলা করতে শেখে, বিশৃঙ্খল আচরণ কম হয়, সর্বোপরি তাদের সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে সহজভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

কাজ ১– সমবয়সী দলের মাধ্যমে শিশুরা কোন ধরনের আচরণ শেখে?
কাজ ২– স্কুলে পাঠক্রমের বাইরের কার্যক্রম কোন ধরনের আচরণ বিকাশে সহায়তা করে, তা লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কিসের প্রয়োজন?

ক.	অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা	খ.	নিরাপদ পরিবেশে বসবাস
গ.	বছরের পর বছর শিক্ষা	ঘ.	অপরের ওপর নির্ভরশীলতা

২. সমবয়সিদের সাথে মেলামেশার ফলে শিশুর মধ্যে গড়ে উঠে–

i. আত্মবিশ্বাস
ii. সহযোগিতার মনোভাব
iii. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.	i ও ii	খ.	i ও iii
গ.	ii ও iii	ঘ.	i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো **এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রুমা ও কণা দুই বোন। প্রত্যেকে যেন নিজের কাজ নিজে করে, এ ব্যাপারে তাদের মা তাদের উৎসাহিত করেন। রুমা ৭ম শ্রেণির এবং তার বোন কণা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। রুমা প্রায়ই তার বোনের বই, কাপড় ও বিছানা গুছিয়ে দিয়ে থাকে।

৩. **রুমার মাঝে কোন ধরনের মনোভাব লক্ষ করা যায়–**

ক. সহযোগিতার খ. শৃঙ্খলাবোধের
গ. নেতৃত্বদানের ঘ. সমবেদনার

৪. **রুমার আচরণ কণাকে পরবর্তী সময়ে করে তুলবে–**

i. কর্মে অনাগ্রহী
ii. পরনির্ভরশীল
iii. অন্যের প্রতি সহমর্মী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. কর্মব্যস্ত স্বামী ও দুই সন্তান সুমন ও সুমনাকে নিয়ে রেবেকার সংসার। রেবেকা সন্তানদের সাথে বন্ধুর মতো ভাব বিনিময় করেন। সমবয়সিদের সাথে তাদের সহযোগী মনোভাব তৈরিতে রেবেকা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সুমন ও সুমনার বাবা শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সন্তানদের সময় দেন ও তাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ও পার্কে বেড়াতে নিয়ে যান।

ক. পরিবার কী?
খ. দেশের সুনাগরিক তৈরিতে সমাজের নিয়মনীতি অনুসরণ প্রয়োজন কেন?
গ. সন্তানদের প্রতি রেবেকার আচরণ শিশুর কোন ধরনের আচরণ বিকাশে সহায়ক? বুঝিয়ে লেখো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশ শিশুদের সুস্থ বিকাশের সহায়ক– বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

২. ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া রনি তার সহপাঠীদের সাথে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। রনি তার বন্ধুদের নিয়ে তার এলাকাকে দূষণমুক্ত করতে সবুজ সংঘ নামে একটি সংঘ তৈরি করে। রনি ও তার বন্ধুরা এলাকাবাসীর সহায়তায় এলাকার ময়লা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার জন্য কয়েকটি বড় ড্রামের ব্যবস্থা করে। রনি ও তার বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত 'সবুজ সংঘ' এলাকার উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের কাজ করে যা সবার কাছে প্রশংসিত হয়। রনির মা রনিকে এ ব্যাপারে সব সময় উৎসাহ দেন।

ক. শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালনার অন্যতম কৌশল কী?
খ. ভাইবোনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন কেন
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজের মাধ্যমে রনির চরিত্রের কোন গুণটি বিকশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মায়ের উৎসাহ ও ভালো সঙ্গের প্রভাব রনিকে আজ সুপরিচিত করেছে– উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

পঞ্চম অধ্যায়

শিশুর বিকাশে খেলাধুলা

শিশুর খেলা

শিশুরা খেলে, কারণ খেলা তাদের আনন্দ দেয়। খেলা শুধু আনন্দই দেয় না, খেলার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ঘটে। লাধুলা বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা শেখায় এবং ভাগাভাগি করে নেওয়ার মনোভাব তৈরিতে সাহায্য করে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশু-সঙ্গী সাথিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। শিশুরা নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে, অন্যকে বুঝতে শেখে, অন্যের অনুভূতিকে মূল্য দিতে শেখে। খেলাধুলা তাদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বোধ জাগ্রত করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা কল্পনা ও নতুন কিছু সৃষ্টির চর্চা করে।

শৈশবের প্রথম বছরগুলোতে যখন শিশুর মস্তিষ্ক পড়াশোনার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তখন খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন– শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা মুখস্থ করার চেয়ে খেলার মাধ্যমে শিশুকে শেখানো সহজ হয়। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, খেলা শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকেরা দেখেছেন যে, খেলাধুলা শিশুর শারীরিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনের সহজ মাধ্যম যা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। খেলা শিশুদের অভিজ্ঞতা বাড়ায়, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার চর্চা শিশুর বিনোদনের মাধ্যম। খেলাধুলা শিশুকে অপরাধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করে। যেসব শিশুর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা আছে খেলাধুলা তাদের জন্য উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে।

পাঠ ১ – খেলাধুলার শ্রেণিবিভাগ

বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে খেলাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়। যেমন–

অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা– শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুরা যে খেলাগুলো খেলে থাকে তাই অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা। যেমন– দৌড়াদৌড়ি, বল খেলা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, গাছে চড়া ইত্যাদি। জন্মের পর প্রথম দুই বছর শিশু হাত-পা নাড়াচাড়া করে, আঙুল মুখে দিয়ে আনন্দ পায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অঙ্গ সঞ্চালনে পরিবর্তন ঘটে। একটু বড় হলে হামাগুড়ি দেওয়া, দোলা, দৌড়ঝাঁপ, বেয়ে ওঠা ইত্যাদি অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা শিশু করে থাকে। সাধারণত ৫ বছরের পর থেকে শিশুরা এ ধরনের খেলায় দক্ষতার পরিচয় দেয়। ৭ ও ৮ বছর বয়সে শিশুরা দলবদ্ধ হয়ে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা করে থাকে। যেমন– ফুটবল, বৌছি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা ইত্যাদি।

আবিষ্কারমূলক খেলা– অনেক সময় শিশু খেলনাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে খেলনার গঠন রহস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। এতে খেলনাটি ভেঙে যায় ঠিকই কিন্তু খেলনার ভেতরে যন্ত্রপাতি দেখে শিশু আনন্দ পায়। এ থেকে শিশু বস্তুর আকার আকৃতি, কীভাবে এগুলো তৈরি হয়েছে, কীভাবেই বা কাজ করে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

গঠনমূলক খেলা– শিশু যখন তার নিজের ধারণা এবং অনুভূতি দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করে, তখন সেটা গঠনমূলক খেলা হয়। সাধারণত ৩ বছর বয়সের পর থেকে শিশুর মধ্যে গঠনমূলক খেলার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। যেমন– কাগজ দিয়ে প্লেন ও নৌকা তৈরি, বালি, কাদামাটি, আটার মণ্ড ও ব্লক দিয়ে বাড়ি, সেতু ও নানা আকৃতির জিনিস তৈরি করে শিশু আনন্দ পায়। এতে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। শিশুরা ছবি আঁকা ও রং করার মাধ্যমে সহজেই নিজের ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

আবিষ্কারমূলক খেলা

গঠনমূলক খেলা

কাল্পনিক বা নাটকীয় খেলা

কাল্পনিক বা নাটকীয় খেলা– সাধারণত ২ ও ৩ বছর বয়সের শিশুরা বাস্তব জীবনের অনুকরণে অভিনয় করে খেলে। যেমন– শিশু মা সেজে খেলে, ডাক্তার ও রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করে, গাড়িচালক, ফেরিওয়ালা, পাইলট ইত্যাদি চরিত্র অনুকরণ করে খেলে। এই খেলা শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করে, সমাজে কার কী ভূমিকা বা দায়িত্ব সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে আনন্দ লাভ

অনেক সময় শিশুরা নিজে অংশগ্রহণ না করে অন্যের খেলা দেখেও আনন্দ পায়। টিভি দেখা, গল্প শোনা ইত্যাদিও এক ধরনের খেলা, যা থেকে শিশুরা আনন্দ লাভ করে। এতে ভাষার বিকাশ হয়, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

স্থানভেদে খেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১) বহিরাঙ্গন খেলা (Outdoor Games) ও

২) অভ্যন্তরীণ খেলা (Indoor Games)

১) বহিরাঙ্গন খেলা– যে খেলা গৃহের বাইরে খোলা মাঠ বা জায়গায় খেলা হয় তাকে বহিরাঙ্গন খেলা বলে। যেমন– ফুটবল, কাবাডি, ক্রিকেট, গোল্লাছুট, কানামাছি ইত্যাদি। এ ধরনের খেলায় অঙ্গ সঞ্চালন হয় যা শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন।

বহিরাঙ্গন খেলা– ফুটবল

২) অভ্যন্তরীণ খেলা– গৃহ পরিবেশ অথবা আবদ্ধ স্থানে অনুষ্ঠানযোগ্য খেলাকে অভ্যন্তরীণ খেলা বলে। যেমন– দাবা, বাগাডুলি, ব্লক দিয়ে খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। এ ধরনের খেলায় বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।

পাঠ ২ – শারীরিক বিকাশে খেলাধুলা – শিশুকালে এমন অনেক খেলা আছে যে খেলাগুলো করতে দেখলে বোঝা যায়, শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে এগোচ্ছে। খেলা শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও শক্ত করে।

- অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলাধুলার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত ও গভীর হয়। এতে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, যা শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- খেলার মাধ্যমে যে ব্যায়াম হয়, যার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ উপকার হয়। খেলাধুলা না করলে বা অলসভাবে সময় কাটালে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না।
- খেলাধুলার ফলে যে আনন্দ, বিনোদন হয় তাতে দেহমন উপকৃত হয়। খেলাধুলা তাদেরকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করে যে, তাদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও সচেতনতা ফিরে আসে।
- শিশুরা বড় হলে তাকে যে বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে হবে, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা তাকে পূর্বপ্রস্তুতি দেয়। বড় হয়ে শিশুকে অনেক পরিশ্রমী হতে হয়, খেলার মাধ্যমে পরিশ্রমী হওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়। অল্পতেই শিশু ক্লান্ত হয় না।
- শারীরিক পরিশ্রম না হলে খাবার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশক্তি দেহে জমা থাকে। খেলাধুলার ফলে এসব বাড়তি শক্তি দহনের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়। ফলে শিশু সুস্থ ও সবল থাকে। তা না হলে এসব অতিরিক্ত শক্তি দেহে মেদ হিসেবে জমা হয় এবং শিশুর ওজন বেড়ে যায়।
- বেশিরভাগ বহিরাঙ্গন খেলা শিশুর শারীরিক বিকাশ এবং সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিশুর সুস্থতা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পিতামাতারও মানসিক সন্তুষ্টি আসে।

সুতরাং শারীরিক বিকাশে খেলাধুলা যেভাবে সহায়তা করে তা হলো–

- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়ার ফলে ব্যায়াম হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়
- রক্ত চলাচল ভালো হয়
- দূষিত পদার্থ ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়
- মাংস পেশি সতেজ ও সবল থাকে
- পেশি চালনার নৈপুণ্য অর্জিত হয়
- হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে ক্ষুধা বাড়ে
- ঘুম ভালো হয়

অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা শরীরকে সুস্থ রাখে

বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনে পর্যাপ্ত খেলার মাঠের অভাবে শিশুরা গৃহের ভেতরের খেলা খেলতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে কম্পিউটার গেইম অন্যতম। কম্পিউটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় কোনো অঙ্গ সঞ্চালন হয় না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয় না, দেহের ওজন বেড়ে যেতে পারে। ঘাড়ে, পিঠে ও কোমরে ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া কম্পিউটার স্ক্রিনে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকার কারণে চোখের নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দীর্ঘ সময় কম্পিউটার গেইম খেলা শরীরের অনেক ধরনের ক্ষতি করতে পারে

কাজ ১ – তোমার জানা বহিরাঙ্গন খেলা ও অভ্যন্তরীণ খেলার তালিকা তৈরি করো।
কাজ ২ – শারীরিক বিকাশে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলার গুরুত্ব বর্ণনা করো। দীর্ঘ সময় কম্পিউটার গেইম খেলা কেন ক্ষতিকর তা লেখো।

পাঠ ৩ – সামাজিক বিকাশে খেলাধুলা

খেলাধুলা যেমন আমাদের আনন্দ দেয় তেমনি আমাদের সামাজিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ খেলাধুলা আমাদের সামাজিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে। দলগত খেলার মাধ্যমেই সাধারণত শিশু সামাজিক গুণগুলো অর্জন করে। যেমন– খেলার মাধ্যমে শিশু যখন অন্যের সাথে মেলামেশা করে, কথা বলে, দল গঠন করে, দলে নেতৃত্ব দেয় তখন থেকেই শিশুর মধ্যে সামাজিকতার বিকাশ ঘটে।

বয়সের সাথে সাথে শিশু খেলাধুলার মাধ্যমে সামাজিক হতে শেখে। যেমন–

একাকী খেলা– শিশু জন্মের প্রথম বছরে একা একা নিজের হাত-পা নিয়ে খেলে। কোনো জিনিস নেড়েচেড়ে দেখে, চুষে ও বাজিয়ে শব্দ করে সে আনন্দ পায়। এটা একাকী খেলা। এখানে বস্তুর ব্যবহার থাকতে পারে আবার নাও পারে। এ বয়সে তার সামাজিক বিকাশ হয় না বলেই সে একা একা খেলে।

পাশাপাশি খেলা– একে অন্যের সাথে না খেলে পাশাপাশি বসে একই সরঞ্জাম দিয়ে খেলে। তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকে না। এটাই সামাজিকতার প্রথম ধাপ। দেড় থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা এই ধরনের খেলা খেলে।

সহযোগিতামূলক খেলা –পরস্পরের মধ্যে খেলার সামগ্রী বিনিময় বা আদানপ্রদান করে খেলে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স থেকে শিশুরা এ ধরনের খেলা খেলতে শুরু করে।

একাকী খেলা

পাশাপাশি খেলা

সহযোগিতামূলক খেলা

সমবায় খেলা

সমবায় খেলা– এই খেলা শিশুরা দলগঠন করে খেলে। যেমন– ক্রিকেট, ফুটবল, হাডুডু ইত্যাদি। শৈশবে নিজেরাই খেলার নিয়মকানুন তৈরি করে খেলে। ফলে তাদের মধ্যে দলীয় নিয়মকানুন মেনে চলা, সচেতনতা, সহযোগিতা করার প্রবণতা ইত্যাদি সামাজিক গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। পাঁচ বা ছয় বছর বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে সমবায় খেলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

খেলার মাধ্যমে শিশু যে সামাজিক গুণাগুণ অর্জন করে সেগুলো হচ্ছে–

- নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়
- নেতৃত্ব দানের গুণাবলির বিকাশ হয়
- দলের সাথে সহজে খাপ খাওয়ানো শিখে
- খেলার সরঞ্জাম ও তথ্য আদানপ্রদান করা শিখে
- গঠনমূলক কাজের বিকাশ ঘটে
- রীতিনীতি, আইনকানুন মেনে চলার প্রবণতা তৈরি।

দলীয় খেলার মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক বিকাশ ঘটে

অতি শৈশবে শিশু মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে খেলে। ফলে শিশুর সাথে পরিবারের সবার একটি মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দলগত খেলা শিশুর সামাজিক গুণাবলি অর্জনের সাথে সাথে নৈতিক গুণাবলি বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নৈতিকতার প্রাথমিক শিক্ষা যদিও শিশু পরিবার থেকে অর্জন করে তবে চর্চা হয় খেলার মাঠে। আত্মবিশ্বাস, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা, সৎ ও সত্যবাদিতা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধ শিশু খেলার মাধ্যমে সহজেই অর্জন করতে পারে।

কাজ ১– তোমার জানা দুটি খেলার বর্ণনা দাও। খেলাগুলো কীভাবে সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে লেখো।

পাঠ ৪ – বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা বিকাশে খেলাধুলা

আমরা অনেক ধরনের খেলা খেলি। তার মধ্যে কতগুলো খেলা আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। যে যত বুদ্ধিমান সে তত সৃজনশীল। বুদ্ধি হচ্ছে একটি মানসিক ক্ষমতা, যার মাধ্যমে আমরা সহজেই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি। যেকোনো ধরনের খেলাই হোক না কেন, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ বা কৌশলী না হলে খেলায় নৈপুণ্য দেখানো যায় না।

ছবি আঁকা

দাবা খেলা

বুদ্ধি বিকাশের ধারা অনুযায়ী শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন খেলা খেলে। যেমন– আবিষ্কারমূলক খেলা, গঠনমূলক খেলা, সৃজনধর্মী খেলা ও নাটকীয় খেলা। এইসব খেলা শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশে সহায়তা করে। কারণ এসব খেলার মাধ্যমে শিশু চিন্তা ও কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে পারে। তবে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশে সৃজনশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৃজনশীলতা শিশুকে গতিশীল করে। খেলার মাধ্যমে সহজেই সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানো যায়। সৃজনশীলতা অর্থ হচ্ছে নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রকাশ বা নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কাগজ, কাঠের টুকরা, কাদা, বালু, ব্লক, ফুল, ডাল, পাতা, ফেলে দেওয়া বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন– কাগজের বাক্স, ডিসপোজেবল কাপ, কৌটা ইত্যাদি দিয়ে শিশু যখন নতুন কিছু তৈরি করে তখনই সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে। শিশু সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের অব্যক্ত ইচ্ছার প্রকাশ সহজেই ঘটাতে পারে।

বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশে প্রয়োজন

১। **চিন্তার সহজ ব্যবহার**– এটা সৃজনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুরা ছবি এঁকে, রং করে, গল্প ও কবিতা লিখে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে। তবে এর জন্য দরকার চিন্তার প্রসারতা, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, শব্দের সমর্থক শব্দ জানা এবং সেটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। বাধাহীনভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা প্রকাশ করতে পারার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়।

২। **স্বকীয়তা বা নিজস্বতা**– সৃজনশীল আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সব সময় স্মৃতিকে ব্যবহার না করে নতুন কিছু সৃষ্টির চিন্তা করা। এর মধ্যে থাকতে হবে শিশুর নিজস্বতা ও নতুনত্ব।

খেলার মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশে যা করণীয়–

- শিশুদের খেলার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। গঠনমূলক, আবিষ্কারমূলক ও সৃজনশীল খেলায় শিশুকে উৎসাহিত করা।
- খেলা যাতে শিশুর কৌতূহল বাড়াতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে খেলার উপকরণের ব্যবস্থা করা। যেমন– গাছের ডাল, ফুল, পাতা, কাগজ, রং, তুলি, কাদা মাটি ইত্যাদি।
- শিশুদের খেলার সরঞ্জাম নিরাপদ ও আকর্ষণীয় হওয়া।

- খেলার স্থান পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস পূর্ণ, খোলামেলা ও নিরাপদ হওয়া।
- খেলায় আগ্রহী করার জন্য বয়স উপযোগী সঠিক খেলনা শিশুকে দেওয়া।
- শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলতে দেওয়া ও সব সময় খেলায় হস্তক্ষেপ না করা।

শিশুর জীবনে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য দামি খেলনা বা ব্যয়বহুল উপকরণের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন খেলার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন ধরনের খেলায় শিশুকে উৎসাহিত করা।

কাজ ১– কোন কোন খেলা তোমার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায় তার তালিকা করো।

পাঠ ৫– শিশুর শখ ও বিনোদন

শখ শব্দের অর্থ হচ্ছে মনের ঝোঁক বা আগ্রহ। আর বিনোদন হচ্ছে তাই যা মনকে প্রফুল্ল রাখে। শিশুদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের শখ লক্ষ করা যায়। যেমন– কেউ ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, কেউ খেলনা সংগ্রহ করে, কেউ মুদ্রা সংগ্রহ করে, কেউ ছবি, ভিউকার্ড, পোস্টার সংগ্রহ করে। গল্প বা কবিতার বই পড়ে, কেউ বা ফেলে দেওয়া কৌটা, ছোট বাক্স সংগ্রহ করে; আবার কেউ ভ্রমণ করে, ছবি এঁকে, বাগান করে শখ পূরণ করে। শখ ও বিনোদন অনেকটা নির্ভর করে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও পরিবেশের ওপর। শখ ও বিনোদনের অনেক শিক্ষাগত দিক রয়েছে।

৫০প
50P
BANGLADESH
বাংলাদেশ
BANGLADESH
ONE CENT
FIRST-CLASS
USA

ডাকটিকিট

সমুদ্রসৈকত

ডাকটিকিট– ডাকটিকিট সংগ্রহ করে দেশ ও বিদেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আবার প্রতিযোগিতায় ডাকটিকিট প্রদর্শন করে পুরস্কার লাভ করা সম্ভব।

বই– ছড়া, রম্যরচনা, মুক্তিযুদ্ধের বই, কার্টুন, রহস্যমূলক বই, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনী, গল্প ও কবিতার বই পড়ে জ্ঞানভাণ্ডার, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

ভ্রমণ– ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিসর্গের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশের রুপালি নদী, সবুজ বনানী, নীল আকাশ ও গ্রামবাংলার নান্দনিক রূপ লাভ করা যায়। বাংলার দর্শনীয় স্থানগুলো হচ্ছে– ঢাকার লালবাগ কেল্লা, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শিশু পার্ক, যাদুঘর, ফয়'জ লেক, পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, রাঙ্গামাটি, সিলেটের মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, জাফলং-এর পাহাড়ি নদীর স্বচ্ছ জলধারা, খাসিয়া পল্লী, কুয়াকাটার সাগরসৈকত, কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়, নওগাঁর পাহাড়পুর ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করে জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করা যায়।

মুদ্রা সংগ্রহ– পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং এর নামও বিভিন্ন। আবার মুদ্রার উপর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, স্থান ও প্রতীকের ছাপ থাকে। যেমন– বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা, ইলিশ মাছ, হরিণ, কাঁঠাল ইত্যাদির ছবি আছে। এইসব ছবি থেকে একটি দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

ভিউকার্ড, পোস্টকার্ড– ভিউকার্ড, পোস্টকার্ডে বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য স্থান, নামকরা ব্যক্তি, কৃষি ও শিল্পপণ্য, শিল্পকর্ম, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। এ থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নিজের হাতে ছবি এঁকে কার্ড তৈরি করে যেমন আনন্দ লাভ করা যায় তেমনি সৃজনীশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গান গাওয়া

বাগান করা

গান ও কবিতা আবৃত্তি– গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করে অবসর সময়কে কাজে লাগানো যায়। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় অন্যকেও আনন্দ দেওয়া যায়।

বাগান করা ও পশুপাখি পালন– বাড়ির আঙিনায়, টবে, বাড়ির ছাদে ফুল, ফল ও সবজি বাগান করে নিজের শখ পূরণ করা যায়, বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় এবং পরিবারের ফল ও সবজির চাহিদা মেটানো যায়। কবুতর, কোয়েল পাখি, মুরগি, হাঁস, ছাগল ইত্যাদি পালন করে শখ ও বিনোদন লাভ করা যায়। শিশুর সার্বিক বিকাশে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে শখ ও বিনোদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ ১– পড়াশোনার পাশাপাশি তুমি কীভাবে তোমার শখ পূরণ কর তা বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি গঠনমূলক খেলা?

ক. সাঁতার কাটা   খ. সাইকেল চালানো
গ. পুতুল তৈরি   ঘ. কানামাছি

২. কোন খেলাটির মাধ্যমে নেতৃত্বদানের গুণটি গড়ে উঠে?

ক. রং করা   খ. দাবা
গ. ফুটবল   ঘ. ছবি আঁকা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফাহিম খুব ভালো ছাত্র। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ে ও ছবি এঁকে খুব মজা পায়। মায়ের সাথে দাবা খেলে প্রায়ই সে জিতে যায়।

৩. খেলার মাধ্যমে ফাহিমের মাঝে কোনটির বিকাশ ঘটে?

ক. নৈপুণ্যতা   খ. সামাজিকতা
গ. অনুকরণীয় মনোভাব   ঘ. পেশির সবলতা

৪. নিচের কোন ক্ষেত্রে ফাহিমের অগ্রগতি হচ্ছে?

i. মানসিক বিকাশ
ii. বুদ্ধিমত্তা
iii. উদ্ভাবনী শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. ফারাজ তার বিদ্যালয়ের ফুটবল টিমের নির্ভরযোগ্য গোলকিপার। সে প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। অবসর সময়ে সে প্রায়ই কাগজ কেটে বিভিন্ন রকমের ফুল, পাখি ও নকশা তৈরি করে। এছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ করা এবং বই পড়াও তার অন্যতম শখ।

ক. দাবা কোন ধরনের খেলা?

খ. মুদ্রা সংগ্রহ করার অভ্যাস কেন বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান বৃদ্ধিতেও সহায়ক?

গ. অবসর সময় কাটানোর উপায়টি ফারাজের মাঝে কোন ধরনের বিকাশ ঘটায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ফারাজকে অনুসরণ করার মাধ্যমে সামাজিক গুণ অর্জন সহজেই সম্ভব– বিশ্লেষণ করো।

২. সুমিতা একজন কর্মজীবী গৃহিণী। পাঁচ বছর বয়সি একমাত্র মেয়ে মিতাকে তিনি সব সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে দেন। মিতা টিভি দেখে ও কম্পিউটারে গেমস খেলে অবসর সময় কাটায়। ইদানীং সুমিতা খেয়াল করছেন মিতা দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং সমবয়সি বাচ্চাদের সাথে মেশার পরিবর্তে একা একা গেমস খেলে।

ক. প্রতিটি সুস্থ শিশু দিনের অধিকাংশ সময় কী করে কাটায়?

খ. বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খেলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় বুঝিয়ে লেখো।

গ. মিতার শারীরিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মিতার সময় কাটানোর প্রক্রিয়া তার সামাজিক বিকাশে কীরূপ প্রভাব ফেলবে– বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের চারপাশে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো নয়। তাদের দেহের গঠন আলাদা, তাদের আচরণ স্বাভাবিকের তুলনায় ধীর বা সমস্যাগ্রস্ত। এদের মধ্যে কেউ চোখে ভালো দেখতে পায় না, কারও হাঁটাচলায় অসুবিধা, কারও অন্যের কথা বুঝতে দেরি হয়, কেউ বা বয়সে বড় হলেও শিশুদের মতো আচরণ করে। এসব শিশু কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। এরাই প্রতিবন্ধী শিশু। এদেরকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুও বলা হয়। কারণ এদের পূর্ণ বিকাশে বিশেষ যত্ন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এসব প্রতিবন্ধীদের জীবন যাপনে সহায়তার জন্য এদের সম্বন্ধে আমাদের সবার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। এজন্য প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়।

কেউ জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে, কেউ জন্মের পর যেকোনো দুর্ঘটনা, অপুষ্টি বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ প্রতিবন্ধী। এই হিসাবে আমাদের দেশে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। দরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের দেশে এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঠ ১ – প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ

প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন – শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

শারীরিক প্রতিবন্ধী

যাদের হাত কিংবা পা অসম্পূর্ণ, অবশ, দুর্বল থাকে, দেহের গঠন স্বাভাবিক নয় বা দেহের কোনো অংশ ব্যবহারে অক্ষমতা থাকে, যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অসুবিধা হয়, তারাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। যেমন – পায়ের গঠনে ত্রুটি থাকলে চলাচলে এবং হাতের গঠনে ত্রুটি থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। বুদ্ধিগত কোনো সমস্যা না থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারে। তাদেরকে শারীরিক সমস্যার জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণের সহায়তায় চলাফেরা করতে হয়। যেমন– ক্রাচ, ওয়াকার, হুইল চেয়ার ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে চলাচলের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গায় র‍্যাম্প (সিঁড়ির স্থানগুলোতে ঢালু রাস্তা)- এর ব্যবস্থা করলে তাদের চলাচলে বিশেষ সুবিধা হয়।

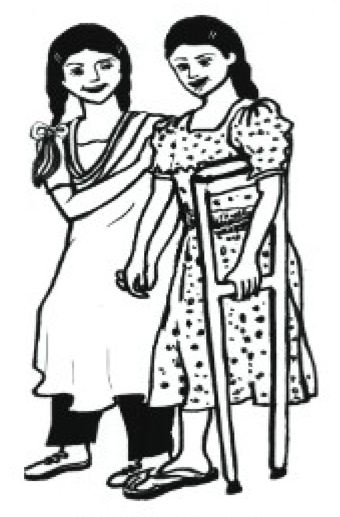

শারীরিক প্রতিবন্ধী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

চোখে দেখতে পারে না বা চোখে দেখায় এমন ধরনের সমস্যা থাকে যার কারণে জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে অসুবিধা হয় এবংযারা চোখে আংশিক বা পুরোপুরি দেখতে পায় না তারাই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দেখতে সমস্যা হয় বলে চলাফেরা ও কাজকর্ম ধীরে হয়, এসব অসুবিধা তাদেরকে পরনির্ভর করে রাখে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়। **যেমন**–অল্প মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং আংশিক মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা। অল্প মাত্রার প্রতিবন্ধীরা অন্ধকার ছাড়া কোনো কিছুই দেখে না বা উজ্জ্বল আলো আসার গতিপথ বলতে পারে। এরা অঙ্ক, সংখ্যার ধারণা, শব্দ ভান্ডার এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শিশুর মতোই হয়। তারা স্পর্শ দিয়ে বস্তু চেনে, বস্তুর নাম শেখে। জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্য বুঝতে পারে না, যেসব দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু পরবর্তী সময়ে অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে দৃষ্টি হারায় তাদের মনের কষ্ট অনেক বেশি। আংশিক মাত্রার প্রতিবন্ধীরা দূরের জিনিস দেখতে পারে না। কাছের জিনিস অস্পষ্ট দেখলেও কাজ করতে তাদের অসুবিধা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির নাম ব্রেইল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে স্পর্শের মাধ্যমে উঁচু ফোঁটা দিয়ে বর্ণ ও সংখ্যা তৈরি করে লেখাপড়া করানো হয়।

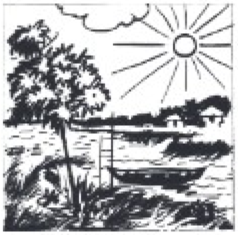 স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যেভাবে দেখতে পায়	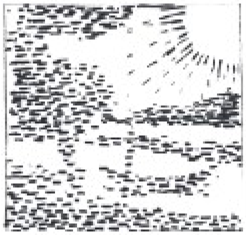 আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যেভাবে দেখতে পায়	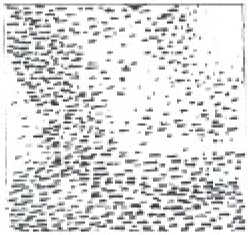 শুধু একটি উজ্জ্বল আলো আসার গতিপথ বলতে পারে	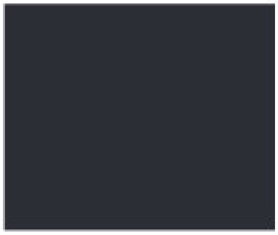 পরোপুরি দৃষ্টিহীন শিশু যা দেখে

শ্রবণ প্রতিবন্ধী– যাদের শোনার ক্ষমতায় ঘাটতি, যার কারণে কথা শুনতে বা কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এদের ক্ষেত্রে বধির বা কালা এবং কানে খাটো ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি স্বাভাবিক শিশু শব্দ ও কথা শোনে, তারপর তারা কথা বলতে শেখে। যেহেতু শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা শব্দ বা কথা শুনতে পারে না, তাই তারা কথা বলতে শেখে না। জন্ম থেকেই বা কথা শেখার আগেই এ সমস্যা দেখা দিলে ভাষার বিকাশ হয় না। এই সমস্যা অল্প বা গুরুতর হতে পারে। অল্প মাত্রার সমস্যা হলে তারা জোরে কথা বললে কিছুটা শুনতে পারে। গুরুতর শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা থাকলে কোনো শব্দই শুনতে পায় না। তারা কথা বলার পরিবর্তে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বা ইশারায় নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। এদের কথা কেউ বুঝাতে পারে না বলে সব সময়ই এরা হতাশাগ্রস্ত থাকে।

পাঠ ২– বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

যাদের বুদ্ধি বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকে, যার ফলে শিশু তার সমবয়সিদের মতো আচরণ করতে পারে না। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সমস্যা ধরা পড়ে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতারও বিভিন্ন মাত্রা থাকে। যেমন– মৃদু, মধ্যম, গুরুতর।

মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা – এদের বুদ্ধি ৮ থেকে ১১ বছরের শিশুর মতো হয়। তাই প্রাপ্তবয়সে ১১ বছরের স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা যেসব লেখাপড়া বা কাজ করার বুদ্ধি রাখে, ততটুকু পর্যন্ত মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুটি লেখাপড়া বা আচরণ করতে পারে। এদেরকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভর করা সম্ভব।

মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা– এদের বুদ্ধি ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর মতো হয়। তাই ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর মতো আচরণ করে। এদের বাচন ত্রুটি ও নানারকম শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। যেমন– ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ, শিশুসুলভ ভাষা ইত্যাদি। এদের প্রশিক্ষণ দিলে কিছু শিখতে পারে। এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে এদের পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এদেরকে কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ শেখানো যায়। যেমন–প্যাকেট করা, সিল মারা, বেকারির কাজ ইত্যাদি।

গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা– এদের বুদ্ধির মাত্রা এত কম থাকে যে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মতো হয়। তারা খাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, টয়লেট কাজ সম্পন্ন করতে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। এদের অনেক ধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায়। অন্যের তত্ত্বাবধানে এদের জীবন ধারণ করতে হয়। বিশেষ যত্ন ও প্রশিক্ষণে তাদের দৈনন্দিন কাজের অভ্যাস তৈরি করা যায়।

বাক্ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের সমাজে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের অনেক সময় পাগল বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা কোনো মানসিক রোগ নয়। এটি এক ধরনের মানসিক অবস্থা বা অক্ষমতা। এই অক্ষমতা চিকিৎসা দিয়ে সারানো যায় না। তবে যে যতটুকু মাত্রায় প্রতিবন্ধী, সে বিশেষ যত্ন পেলে তার ক্ষমতা অনুযায়ী আচরণ করতে পারে। আবার বিশেষ যত্নের অভাবে তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হয় না। তার আচরণের অবনতি ঘটে।

এছাড়া একই সাথে একাধিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে তারা বহুবিধ প্রতিবন্ধী। যেমন–শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ ও বাক্, বুদ্ধি ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধিতার মাত্রা গুরুতর হলে তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এ ধরনের প্রতিবন্ধীরা খাবার ও টয়লেটের কাজের জন্য প্রায় অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে বা বিশেষ সরঞ্জাম ছাড়া তারা চলাফেরা করতে পারে না। মৃদু ও মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হয়। একটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্পর্কে জানা থাকলে অতি সহজেই শিশুটি প্রতিবন্ধী কি না তা বোঝা যায়। স্বাভাবিক শিশুর মতো প্রতিবন্ধীদেরও মৌলিক চাহিদা রয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা, উপযুক্ত খাবার, বিশেষ যত্ন ও প্রারম্ভিক উদ্দীপনার।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে, প্রারম্ভিক উদ্দীপনার অর্থ কী? উদ্দীপনা বলতে বোঝায় একটি শিশুকে তার চারপাশের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানা ও দেখার সুযোগ করে দেওয়া আর সেগুলো নিয়ে খেলা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। যেমন–শিশুকে সময় দেওয়া, শিশুর সাথে কথা বলা, গান করা, খেলাধুলা করা, কাজ করা, তাকে ভালোবাসা ইত্যাদি। অতি শৈশব থেকে এই উদ্দীপনার সুযোগ সৃষ্টি করাই হলো প্রারম্ভিক উদ্দীপনা।

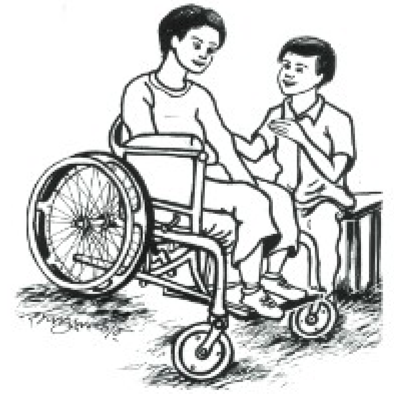
অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য দরকার হয় বিশেষ সহায়ক সরঞ্জাম

প্রতিটি শিশুর দেহ ও মন সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রারম্ভিক উদ্দীপনা দরকার। স্বাভাবিক শিশুরা সহজেই মেলামেশার মাধ্যমে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে এই উদ্দীপনা পায়। কিন্তু প্রতিবন্ধ শিশুদের পক্ষে তার চারপাশের জগৎকে জানা ও বোঝা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এদের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্ন, বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আমাদের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক শিশুর উপযোগী করে তৈরি করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরবর্তী সময়ে এই শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয় না। তার জন্য দরকার প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা। শিশু যত ছোট অবস্থায় এই উদ্দীপনা বা বিশেষ শিক্ষা পায়, তত তাড়াতাড়ি তার আচরণের উন্নয়ন ঘটে এবং সক্ষমতা বাড়ে।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা → **বাড়তি যত্ন** প্রারম্ভিক উদ্দীপনা → **বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** → **বর্তমান অবস্থার উন্নতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি**

কাজ ১– তোমার পরিচিত কোনো প্রতিবন্ধী শিশুর ধরন সম্পর্কে লেখো।

কাজ ২– কী ধরনের প্রারম্ভিক উদ্দীপনা দেওয়া হয় তা লেখো এবং ক্লাসে পড়ে শোনাও।

পাঠ ৩– প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবারের দায়িত্ব

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জানার আগে প্রতিবন্ধী শিশুটির কারণে পরিবারটি কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ে, আমরা তা জেনে নিই–

সমস্যা ১

পরিবারটি যখন সন্তানের অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারেন, তখন তারা চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসকের কাছে সন্তানের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে শোনার পর মা-বাবা বিষয়টি মেনে নিতে পারেন না। তখন তারা বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে ছোটাছুটি করেন। এতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ফলে প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ও বিশেষ যত্ন পেতে শিশুটির বিলম্ব হয়। সব পিতামাতার মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সন্তানটি কবে ভালো হবে? সে কি কোনো দিন কথা বলতে পারবে? কবে থেকে সে বয়স অনুযায়ী আচরণ করবে? তারা মনে করেন, অন্যান্য রোগের মতো প্রতিবন্ধিতাও চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো সম্ভব। তাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট হয় যে, তাদের সন্তানের এই প্রতিবন্ধিতা সারা জীবনের জন্য বহন করতে হবে।

সমস্যা ২

প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম হওয়ায় বিভিন্ন কারণে মায়ের মন ভেঙে যায়। যেমন– অনেক ক্ষেত্রে মাকে এরকম সন্তান জন্ম দেওয়ায় দোষারোপ করা হয়। সন্তানের দেখাশোনার জন্য মায়ের ওপর প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়ে। তখন সন্তানটির প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি উৎসাহ পান না।

সমস্যা ৩

প্রতিবন্ধী শিশুটির চিকিৎসা, বিশেষ যত্ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত শ্রম, সময়, ধৈর্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এগুলোর ব্যবস্থা করতে পরিবারটিকে সমস্যায় পড়তে হয়।

সমস্যা ৪

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে নানা রকম অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। অতিরিক্ত চঞ্চলতা, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, একই কাজ বারবার করা ইত্যাদি আচরণের কারণে সব সময় তাকে দেখে রাখার দরকার হয়। ফলে প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে গেলে আত্মীয়স্বজনেরা অনেক সময় বিরক্ত হন।

প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমস্যার কথা তোমরা জানলে। তোমরা আগের পাঠে জেনেছ যে, শিশুর উপযুক্ত বিকাশের জন্য দরকার উন্নত পারিবারিক পরিবেশ। প্রতিবন্ধী শিশুটির ক্ষেত্রেও উন্নত পারিবারিক পরিবেশ ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। এজন্য যা যা করণীয়–

- প্রতিবন্ধী শিশুটিকে অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতোই ভালোবাসা দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে যদি সে ভালোবাসা পায়, তবে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরাও তাকে সেভাবে ভালোবাসবে।
- শিশুর প্রতিবন্ধিতা বোঝার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে তাকে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম শিখতে সাহায্য করা এবং তার ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন, চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন– স্বল্প মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য চশমা, ছড়ি, শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য ক্রাচ, হুইল চেয়ার, লাঠি, বিশেষ নক্‌শার চেয়ার, জুতা ইত্যাদি।
- যেকোনো অনুষ্ঠানে পরিবারে সবার সাথে তাকে বেড়াতে নিতে হবে। যেমন– পিকনিক, বিয়ে, শিশু পার্ক, মেলা ইত্যাদি। সেখানে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাদের সাথে কথা বলতে বলা, যা কিছু নতুন সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুটি সহজেই সবার সাথে খাপ খাওয়াতে শিখবে। অনেক সময় বাড়িতে অতিথি এলেও শিশুটিকে সামনে আনা হয় না, একা ঘরে রাখা হয়। এতে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
- প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় অপুষ্টির শিকার বেশি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অপুষ্টির কারণেও প্রতিবন্ধী হতে দেখা যায়। যেমন–''ভিটমিন এ"-এর অভাবজনিত কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। এজন্য স্বাভাবিক শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুটির বয়স অনুযায়ী সুষম খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিবারে বাবামায়ের সাথে ভাই-বোন বা অন্যান্য সদস্যদেরও প্রতিবন্ধী শিশুটির বিশেষ যত্নে অংশগ্রহণ করতে হবে। এতে বাবা-মায়ের বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে এবং তারা প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা ও বিশেষ যত্ন

কাজ ১– একজন প্রতিবন্ধীর জন্য পরিবারের দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে লেখো।

পাঠ ৪– প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি সমাজের দায়িত্ব

সমাজ কাদের নিয়ে? সমাজ আমাদের নিয়ে, আমাদের চারপাশের সকলকে নিয়ে। প্রতিবন্ধী শিশুরা সমাজে বড়ই অবহেলিত। তাদের অবহেলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

- প্রতিবন্ধী শিশুরা কম বুঝতে পারে বলে অনেকেই এদেরকে বোকা, পাগল বলে, হাসি-ঠাট্টা করে।
- সমবয়সিরা প্রকাশ্যে তাদের উত্ত্যক্ত করে। খেলায় নেয় না, তার সাথে মেশে না।
- আত্মীয়স্বজন প্রায়ই বেড়ানোর প্রোগ্রামে এদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেন।
- এরা অসুস্থতার কথা ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এজন্য এদের চিকিৎসায় প্রচুর সময়ের দরকার হয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসায় অবহেলা দেখা যায়।
- বিশেষ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষক, কর্মচারী আন্তরিক না হলে এদের অযত্ন হয়। যেমন–এদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলা, এদের প্রতি মনোযোগের অভাব ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তার জন্য কীভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করা দরকার?

প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী আমাদের অবশ্যই তাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীর জন্য ইশারায় ভাষা শিক্ষা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিজের কাজ নিজে করতে পারার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া, তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপার্জন করার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই থাকে শিশুটি যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। এই কার্যক্রম তখনই সফল হবে, যখন শিক্ষকেরা তাদের প্রতি যত্নবান হবেন। তাদের সৌহার্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর, ধৈর্য, আন্তরিকতা একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রশিক্ষণে উৎসাহী করবে, স্কুলে আসতে আগ্রহী করে তুলবে।

তোমরা যদি প্রতিবন্ধী শিশুটির আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী কিংবা সমবয়সি হও, তবে তোমরাও তার উদ্দীপনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারো। তোমরা যা যা করতে পারো–

- যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে সঙ্গ দেওয়া, দেখাশোনার দায়িত্ব তুমি নিজে নিতে পারো।
- প্রতিবন্ধীদের ধরন অনুযায়ী খেলাধুলার আয়োজন করতে পারো। যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের গল্প শোনানো, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সাথে দাবা খেলা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাথে গান, গল্প, ছবি আঁকা ইত্যাদি।
- এলাকায় কোনো প্রতিবন্ধী দরিদ্র হলে তার জন্য আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ নিতে পারো।
- ছোট শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুকে ভয় পায়। তার এই ভয় দূর করার জন্য তুমি ভূমিকা রাখতে পারো। প্রতিবন্ধী শিশুটির অসুবিধাগুলো ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিলে ঐ স্বাভাবিক শিশুটিও প্রতিবন্ধী শিশুটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারে।
- প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নানাভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারো।

সমাজ ও পরিবারের সবার সহযোগিতায় একজন প্রতিবন্ধী কীভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তার একটি ঘটনা তোমাদের জানাই, জন্মগতভাবে চোখে দেখে না ছোট্ট মেয়ে কাজল। তার মা বাবা যখন জানতে পারলেন তাঁদের সন্তান দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তখন তাঁরা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছর আগে আস্তে আস্তে দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়া দাদি বললেন আমিও একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আমি এখনো শব্দ ও স্পর্শ দিয়ে সব কিছু বুঝতে পারি। ওকেও এভাবে শেখাতে হবে। তাঁরা নিকটস্থ পরামর্শ কেন্দ্রের সাহায্যে শিশুটিকে শোনার, অনুভব করার, কোনো কিছুর গন্ধ নেওয়ার প্রচুর উদ্দীপনা দিতে শুরু করলেন। দাদি তাঁর সাথে প্রচুর কথা বলতেন, গান শোনাতেন। তাকে স্পর্শ করে চলাফেরা শেখানো হলো। খেলার মাঠে নেওয়া হলো। তিন-চার বছর থেকে সে নিজেই বাথরুমে যেতে পারত। ছয় বছর বয়সে সে বিশেষ স্কুলে যেতে শুরু করল। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা তাকে সাথে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য আসত। পাড়ার লোকজন যখন তাদেরকে দেখত তারা বুঝতেই পারত না কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী শিশুটির পরিবারের প্রতি যতভাবে সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের সব কাজের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে প্রতিবন্ধী শিশুটির পাশে আমরাও আছি। সমাজের সবার অফুরন্ত ভালোবাসা তাদের এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তাদের জগৎটাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলবে। প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ যত্ন, মনোযোগ ও ভালোবাসায় সে আরও বেশি সক্ষম ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে।

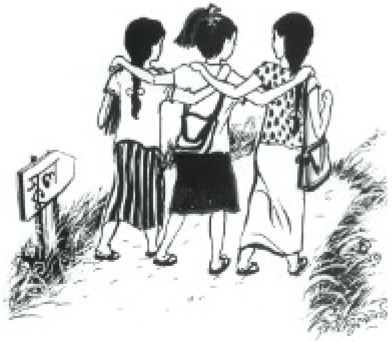

প্রতিবেশীরা বুঝতেই পারে না কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

কাজ ১– প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে তার পরিবার যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে তার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও শিক্ষক কীভাবে সহযোগিতা করতে পারেন তা লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন তারিখে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়?

ক. ২রা ডিসেম্বর খ. ৩রা ডিসেম্বর
গ. ৪ঠা ডিসেম্বর ঘ. ৫ই ডিসেম্বর

২. সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ শিশুকে সহায়তা করতে পারে–

i. উপযুক্ত বিকাশে
ii. অক্ষমতা হ্রাস করতে
iii. আত্মনির্ভরশীল হতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চয়ন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। শিক্ষকের মুখে বলা কথা শুনে সে ঠিকমতো খাতায় লিখতে পারে। কিন্তু বোর্ডের লেখাগুলো ঠিকমতো খাতায় তুলতে পারে না। ফলে শ্রেণির কাজ সময়মতো করতে পারে না। এজন্য শিক্ষক তার উপর অসন্তুষ্ট হতো। এতে ধীরে ধীরে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। শ্রেণি শিক্ষক বিষয়টি লক্ষ করে চয়নের বাবামাকে জানালে তাঁরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

৩. চয়ন হলো

ক. শ্রবণ প্রতিবন্ধী খ. বাক্ প্রতিবন্ধী
গ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ঘ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

৪. **কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চয়নকে এ অবস্থার শিকার হতে হতো না?**

i. পরিবারের সহযোগিতা
ii. শিক্ষকের সহযোগিতা
iii. সময়মতো চিকিৎসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. প্রান্তি ও প্রত্যয় দুই ভাইবোন। প্রত্যয়ের বয়স দুই বছর কিন্তু প্রান্তি এখন কিশোরী। প্রান্তি প্রায়ই প্রত্যয়ের মতো আচরণ করে এবং অকারণে হাসতে থাকে। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে গান শুনিয়ে, ছবি আঁকতে দিয়ে এবং গল্প শুনিয়ে ব্যস্ত রাখে। সবাই প্রান্তির কথা মন দিয়ে শোনে, তার মা ধৈর্যের সাথে তার যত্ন নেন।

ক. **সমাজ কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে?**
খ. প্রারম্ভিক উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় কেন?
গ. প্রান্তির আচরণে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. প্রান্তির পরিবারের সবার আচরণ তাঁর সুস্থতার সহায়ক– বিশ্লেষণ করো।

সপ্তম অধ্যায়

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশুর অধিকার

শিশুকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। আমরা পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েকেও শিশু বলি, আবার দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়েকেও শিশু বলে থাকি। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য শিশুকালকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে, জন্মের পর থেকে বয়ঃসন্ধিকাল বা কিশোর বয়সের আগে পর্যন্ত ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে শিশু। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সের নিচে সবাই শিশু। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সিদের শিশু হিসেবে ধরা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জাতিসংঘ সম্পর্কে জানো, জাতিসংঘ হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে সহযোগিতা দানের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৯১টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি।

পাঠ ১– শিশুর অধিকার

অতি শৈশব থেকেই শিশু যদি অবহেলা অনাদরে জীবন যাপন করে, অপুষ্টি ও রোগের কারণে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে, শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতায় ডুবে থাকে তাহলে তার জীবন বিপন্ন হয়, শৈশবেই তার অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। তাই এই সনদের ৫৪টি ধারায় শিশুকল্যাণ নিশ্চিত করাসহ সকল প্রকার শোষণ, বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে রক্ষার বিবরণ রয়েছে। সনদের কয়েকটি ধারা এখানে আলোচনা করা হলো–

১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু

১৮ বছর পর্যন্ত শিশুর মর্যাদা– জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। যদি না দেশের আইন আরো কম বয়সের ব্যক্তিকে সাবালক হিসেবে অনুমোদন করে।

সকল শিশুরই সমান অধিকার– সনদ অনুযায়ী সব শিশুর সমান অধিকার রয়েছে। এখানে লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, শারীরিক সামর্থ্য এবং ধনী ও গরিব কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। অর্থাৎ কোনো কারণেই শিশুর মধ্যে বৈষম্য থাকবে না।

- শিশুমাত্রই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষার সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে।
- সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী শিশুর নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভাষা চর্চার অধিকার আছে।
- জন্মগত ত্রুটি, দুর্ঘটনার শিকার কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শিশু যদি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হয় সেও স্বাভাবিক শিশুর মতো সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।

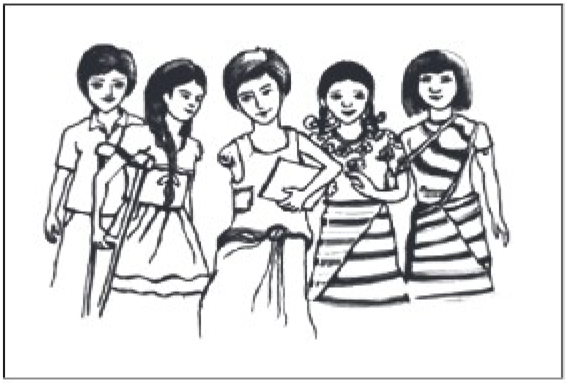

সকল শিশুরই সমান অধিকার

প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে– রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। সব শিশুর জন্য মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সরকারের পক্ষে যদি এ সুযোগ বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে প্রয়োজনবোধে সরকার আর্থিক সহায়তা দেবে। শিশুর স্কুল ত্যাগের হার কমাতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে–

- শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো,
- শিশুর মধ্যে তার মা-বাবা, শিক্ষক, বড় ও ছোটদের প্রতি, নিজের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি এবং অন্যান্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা জন্মানো।

পাঠ ২– শিশুরা কোনো শাস্তি ভোগ করবে না, শিশুর স্বার্থ সবার ওপরে ও শিশুশ্রম

শিশুরা কোনো শাস্তি ভোগ করবে না

১৮ বছরের আগে যদি শিশু কোনো অপরাধমূলক কাজ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। শিশুর ক্ষেত্রে যা করণীয়—

- সংশোধনের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রপাঠানো যাবে।
- শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোরদের বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা সংশোধনের মাধ্যমে অপরাধমূলক আচরণ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া।
- পিতামাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অন্যায় কর্মকাণ্ড বা বিবাদের জন্য শিশু কোনো শাস্তি ভোগ করবে না।

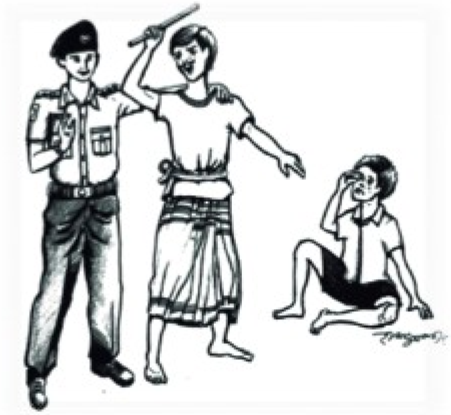

শিশুরা কোনো শাস্তি ভোগ করবে না

শিশুর স্বার্থ সবার উপরে– শিশু বিষয়ে সব কাজে লক্ষ রাখতে হবে, যেন শিশুর স্বার্থই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। এর অর্থ এই নয় যে শিশু যা চাইবে সেটাই করতে হবে। বরং এটাই বলা হচ্ছে যে–

- শিশুর অধিকার রক্ষার্থে যা কিছু প্রয়োজন তা করতে হবে। মা-বাবা অর্থাভাবে যদি শিশুর শিক্ষা, নিরাপত্তা, যত্ন দিতে না পারেন, তখন সরকার শিশুর স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সেবা নিশ্চিত করবে।
- সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। যেমন–ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেন, কেয়ার ইত্যাদি।
- সকল সামর্থ্যবান মানুষের উচিত দুঃস্থ শিশুদের সহযোগিতা করা। তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া ।

শিশুর স্বার্থ সবার উপরে

শিশুশ্রম– আমাদের দেশে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে না গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়। অনেক শিশু আবার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম কাজ করে। এসব শিশু অর্থ উপার্জন করে মা-বাবার হাতে তুলে দেয় সংসার খরচের জন্য। শিশুরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের জন্য যে পরিশ্রম করে তাকেই শিশুশ্রম বলে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এর ২(৬৩) নং ধারায় ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম 'শিশুশ্রম' হিসেবে ধরা হয়।

অনেক শিশু এমন কাজ করে যার ফলে তাদের মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে। এ ধরনের কাজে নিয়োজিত শিশুদের শ্রমকে বলা হয় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম। যেমন– বোঝা বহন, ওয়ার্কশপের কাজ, বর্জ্য থেকে জিনিস সংগ্রহ, টেম্পুর সাহায্যকারী ইত্যাদি। অল্প বয়সের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হলে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই সনদে– শিশুর স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের, বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের এবং অসুস্থতায় চিকিৎসা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না করানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে। এতে তোমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন– তোমার বা তোমার আত্মীয়স্বজনের বাসায় যেসব শিশু কাজ করে তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে। অভিভাবকদের বলে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন উৎসব যেমন ঈদ বা পূজায় দরিদ্র শিশুদের নতুন কাপড় ও ভালো খাবার দেবে এবং বন্ধুদেরকে ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

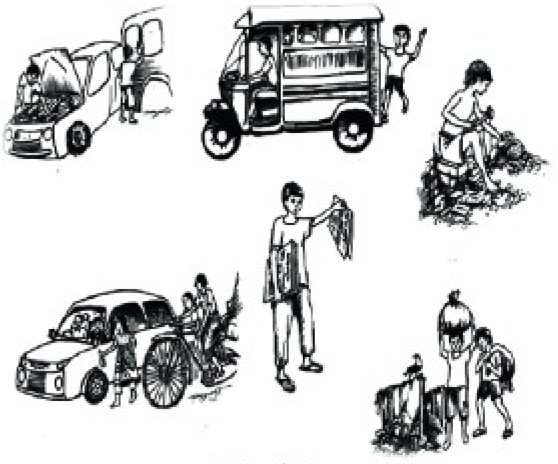

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম

কাজ ১– গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর অধিকারগুলো লেখো।

পাঠ ৩– শিশুপাচার

শিশুপাচার– শিশুপাচার আমাদের দেশের একটি সমস্যা। পাচারকারীরা শিশুর পিতামাতাকে বা অভিভাবককে না জানিয়ে বা প্রতারণা করে, ভয় বা লোভ দেখিয়ে অথবা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে বা অপহরণ করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয় অথবা বিক্রি করে দেয়। একে ' শিশুপাচার' বলে। শিশু চুরির জন্য সংঘবদ্ধ চক্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে। তারা যা করে–

- অর্থের বিনিময়ে শিশুদের দেশের বাইরে পাচার করে
- আটক করে পিতামাতার কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে
- অমানবিক কাজে ব্যবহার করে।

সনদে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পাচার থেকে রক্ষা পেতে যা করতে হবে—

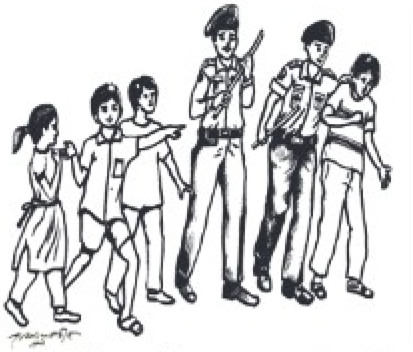

পাচারকারীকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিন

- দূরে কোথাও বা নির্জন জায়গায় একাকী না যাওয়া।
- অপরিচিত বা অল্প পরিচিত কারও সাথে কোথাও না যাওয়া।
- অপরিচিত বা অল্প পরিচিত ব্যক্তির দেয়া কোনো খাবার, খেলনা, টাকাপয়সা ও কোনো জিনিস না নেওয়া। মা-বাবার
- অনুমতি ছাড়া কারও সাথে কোথাও না যাওয়া।
- শিশুপাচারের কৌশলগুলো জানা এবং অপরকে জানানো যেন সবাই এ বিষয়ে সচেতন হয়।
- নিজ এলাকার শিশুসহ সকল মানুষের মধ্যে শিশুপাচার বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশু সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হয়। তাই সীমান্ত এলাকায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা খুব দরকার।

আমাদের দেশে শিশু পাচারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। তার অন্যতম কারণ আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব।

শিশুর মতামত প্রদানের অধিকার– প্রতিটি শিশুর স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের এবং নিজ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় বড়দের জানানোর অধিকার আছে। শিশুর বয়স এবং পরিণত বুদ্ধির কথা বিবেচনা করে বড়দের উচিত শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।

- ৫ ও ৬ বছর বয়স থেকেই শিশুর ভালোমন্দ বোঝার বয়স হয়। পারিবারিক কিংবা সামাজিক অনেক ব্যাপারে শিশু স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার রাখে। যেমন — পারিবারিক বাজেট পরিকল্পনা, মেনু পরিকল্পনা, বেড়াতে যাওয়া, দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত শিশু দিতে পারে এবং পরিবারকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

- অন্য শিশুর সাথে মেলামেশা এবং আইনসম্মতভাবে দলগঠন বা দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে। যেমন– দল গঠন করে খেলাধুলা করা, বেড়াতে যাওয়া যেকোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই পিতামাতা বা শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে। তাঁদের উপযুক্ত নির্দেশনা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

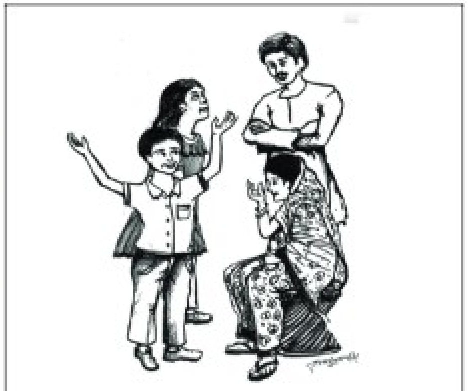

শিশু তার মতামত প্রদান করছে

পাঠ ৪– ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ

ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ। প্রত্যেক শিশুর তার মা-বাবার সাথে একত্রে বাস করার অধিকার রয়েছে।

যদি কোনো কারণে শিশু মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে শিশু যে সুরক্ষা পাবে সেগুলো হলো–

- শিশু যদি তার মা-বাবা একজন বা উভয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের দুজনের সাথেই যোগাযোগ করার অধিকার শিশুটির রয়েছে।

- কোনো শিশু যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন– মা বাবার মৃত্যুর কারণে অথবা মা-বাবা আলাদা থাকার কারণে কিংবা মা-বাবার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণে শিশুটি পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সেই শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

- শিশু হারিয়ে গেলে মা-বাবাকে খুঁজে বের করা এবং শিশুকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি সম্ভব না হয় তাহলে সরকার তার লালন-পালন ও সুরক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেবে। যেসব সংস্থা শরণার্থী শিশুদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে শিশুকে মুক্ত রাখা– মাদকদ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে। এইসব মাদকদ্রব্যের উৎপাদন এবং চোরাচালানে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা খুব বেশি। কৌতূহল, বন্ধুবান্ধবের সাথে

আড্ডা, মানসিক চাপ থেকে মাদক গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে। এই মাদক ছেলেমেয়েদের সব সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। মাদক হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য যা নেশার সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়। তাই মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানা উচিত। ক্ষতিকর দিকগুলো হলো–

- মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ফলে পড়াশোনা ও কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- মাদক গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের প্রতি উগ্র আচরণ করে। পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়।
- মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে নষ্ট করে, ফলে অপরের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়।
- মাদক গ্রহণের ফলে টাকার অপচয় হয়। অন্যান্য জটিল রোগ দেখা যায়, চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাদকদ্রব্য আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি করে। তাই সকলের উচিত মাদক বর্জন করা। এজন্য যা করণীয়–

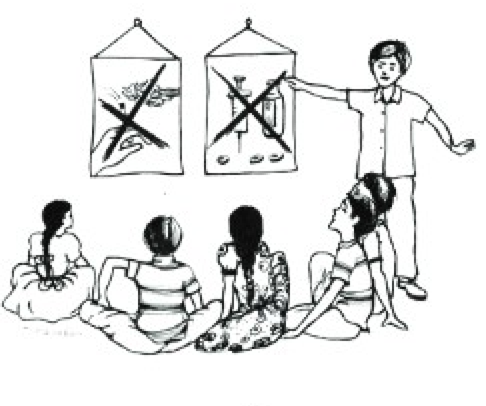

মাদক বর্জন করো

- যেসব জায়গায় মাদক পাওয়া যায় সেখানে যাওয়া উচিত নয়।
- যারা মাদক খায় তাদের সাথে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব করা যাবে না।
- দোকানে বা পাড়ায় কোনো বন্ধুর সাথে আড্ডা দেওয়া উচিত নয়।
- যদি কোনো বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি কোনো ট্যাবলেট, অপরিচিত কিছু খেতে দিয়ে বলে যে, এটি খেলে শরীরে বাড়তি শক্তি পাবে, শরীর চাঙ্গা হবে। এইসব পরিস্থিতি কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে, অবসর সময়ে খেলাধুলা, গান শেখা, গল্পের বই, ছবি আঁকা, সেলাই, বাগান করা ইত্যাদি গঠনমূলক ও সৃজনধর্মী কাজ করবে।

কাজ ১: জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আমাদের দেশের শিশুরা যেসব অধিকার ভোগ করতে পারছে না তার তালিকা তৈরি করে সেই অধিকারগুলো লাভের উপায় লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বেঁচে থাকার অধিকার কোনটি?

ক. তথ্য জানা
খ. স্বাধীনভাবে কথা বলা
গ. মানসম্মত জীবনযাপন
ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে তূর্য প্রায়ই একজন লোককে দেখে। মাঝে মাঝে লোকটি তাকে চকলেট খেতে দেয়। একদিন সে তূর্যকে পার্কে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং একজন অপরিচিত লোকের হাতে তুলে দেয়।

২. তূর্য কোন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে?

ক. ভীতি প্রদর্শন
খ. বৈষম্য
গ. প্রতারণা
ঘ. অবহেলা

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে তূর্য–

i. দেশের বাইরে পাচার হতে পারে
ii. অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে
iii. মুক্তিপণের শিকার হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. রিকশাচালক আবদুল মালেকের বড় সন্তান রানার বয়স ১২ বছর। সে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশোনায় সে খুব ভালো। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তার বাবা অসুস্থ থাকায় ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। এ অবস্থায় আবদুল মালেক তাঁর ছেলেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির পাশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাজে লাগিয়ে দেন।

ক. সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি কোনটি?
খ. সনদ অনুযায়ী সুরক্ষা থেকে কেন বাংলাদেশের অনেক শিশুই বঞ্চিত হচ্ছে?
গ. রানা কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আবদুল মালেকের গৃহীত পদক্ষেপ কতটুকু যুক্তিযুক্ত? বিশ্লেষণ করো।

গ বিভাগ

খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা খাদ্যের ছয়টি উপাদানের উৎস ও কাজ সম্পর্কে জানব। এছাড়া পরিপাক ও শোষণের গুরুত্ব, মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী, সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর ব্যবহার, বিভিন্ন রোগে পথ্য পরিকল্পনা ও পদ্ধতির ধারণা লাভ করব। খাদ্যসামগ্রী যাতে নষ্ট না হয় এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেও খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানাও আমাদের জন্য অতি জরুরি।

এ বিভাগ শেষে আমরা

- খাদ্য ও উপাদানগুলোর প্রকারভেদ, উৎস ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুষম খাদ্য ও খাদ্যের মৌলিক গোষ্ঠী বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিবেশনে পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন রোগের পথ্য ও পথ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- পচনশীলতার ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করে খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য উপাদান, পরিপাক ও শোষণ

খাদ্য উপাদানের প্রকারভেদ, উৎস ও কাজ

আমরা জানি যে, খাদ্যকে ভাঙলে যে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক উপাদান পাওয়া যায় তাদেরকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলো আমাদের শরীরে পুষ্টি সাধন করে, তাই এদেরকে পুষ্টি উপাদানও বলে। আমাদের খাদ্যে প্রধানত ছয় প্রকারের খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় যা নিচের ছকে দেখানো হলো।

খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদান

প্রোটিন | কার্বোহাইড্রেট | স্নেহ পদার্থ | ভিটামিন | খনিজ লবণ | পানি

আমরা এখন উল্লিখিত উপাদানগুলো সম্পর্কে জানব।

পাঠ ১ – প্রোটিন

প্রোটিন– খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব না। এজন্য প্রোটিনকে সকল প্রাণের প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। সব প্রোটিনই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে প্রথমে এমাইনো এসিড এবং পরে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেক এমাইনো এসিড পাশাপাশি যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন অণু গঠিত হয়। নিচে একটা প্রোটিন অণুর রেখাচিত্র দেখানো হলো।

অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড––––––

← **প্রোটিন অণু** →

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ–

উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়

উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

প্রাণিজ প্রোটিন ← → **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন**

(১) **প্রাণিজ প্রোটিন–** যে প্রোটিনগুলো প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। এই প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

(২) **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন–** উদ্ভিদ জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলা হয়। যেমন– ডাল, বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি ইত্যাদি এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

প্রোটিনের উৎস–

প্রোটিনজাতীয় খাদ্য।

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ২০ থেকে ২৫ ভাগ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিন খাবারে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে প্রাণিজ প্রোটিনও গ্রহণ করতে হবে।

প্রোটিনের কাজ

১। **দেহ গঠন ও বৃদ্ধিসাধন** – আমাদের দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন দেহযন্ত্র, রক্ত কণিকা হতে শুরু করে দাঁত, চুল, নখ পর্যন্ত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রোটিন শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে।

২। **ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ** – আমাদের দেহের কোষগুলো প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে নতুন কোষগুলো গঠন করে ক্ষয়পূরণ করতে ও কোনো ক্ষতস্থান সারাতে প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে।

৩। **তাপশক্তি উৎপাদন–** ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন দেহে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে তখন প্রোটিন তাপ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।

৪। **দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি অর্জন–** রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেহে তাদের প্রতিরোধী পদার্থ বা অ্যান্টিবডি তৈরি করা প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৫। **মননশক্তির বিকাশ** – মানসিক বিকাশ বা মস্তিস্কের বিকাশের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য।

দেহে প্রোটিনের অভাব হলে

- বাড়ন্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- মেধা কমে যায়।

কাজ – ১ দৈনিক যে প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলো গ্রহণ করা হয়, তার নাম লেখো।
কাজ – ২ তোমার দেহে প্রোটিন কোন কোন কাজ করে থাকে, তা লেখো।

পাঠ ২– কার্বোহাইড্রেট

আমরা দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করি তার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য এদের গুরুত্ব বেশি। সকল কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন– এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ– কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে সরল চিনি অণু পাওয়া যায়। সরল চিনি অণুর উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। **মনোস্যাকারাইড–** যেসব কার্বোহাইড্রেট একটিমাত্র সরল চিনির অণু দিয়ে গঠিত তাকে মনোস্যাকারাইড বলে। যেমন– গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ।

২। **ডাইস্যাকারাইড–** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে ২টি মনোস্যাকারাইড বা সরল চিনি পাওয়া যায় তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন– সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ।

৩। **পলিস্যাকারাইড–** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে ২-এর অধিক একক মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন– স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ

মনোস্যাকারাইড	ডাইস্যাকারাইড	পলিস্যাকারাইড
• গ্লুকোজ	• সুক্রোজ	• স্টার্চ
• ফ্রুকটোজ	• ল্যাকটোজ	• গ্লাইকোজেন
• গ্যালাকটোজ	• মলটোজ	• সেলুলোজ

কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস

নিচে খাদ্যগুলোকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থেকে কম অনুযায়ী সাজানো হলো–

১। চিনি, গুড়, মিছরি, ক্যান্ডি, চকলেট, মিষ্টি
২। সাগু, এরারুট
৩। চাল, ভুট্টা, যব, গম
৪। আলু
৫। বিভিন্ন ধরনের শুকনা ফল যেমন– খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি
৬। বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম
৭। টাটকা ফল, আঙুর, কলা, আপেল, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত।

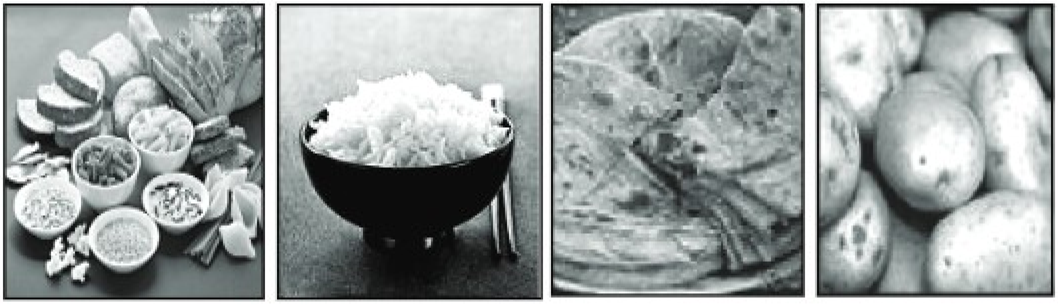

বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য

কার্বোহাইড্রেটের কাজ

(১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

(২) সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

(৩) মস্তিষ্কের কাজ সচল রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানি হিসাবে গ্লুকোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দেহে কার্বোহাইড্রেটের অভাব হলে

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তির ঘাটতি হয়। ফলে শরীর দুর্বল হয় ও স্বাভাবিক কাজ করার শক্তি কমে যায়।

কাজ ১– তুমি কেন কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ৩– স্নেহ পদার্থ

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। প্রায় সব প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুর মধ্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানির চেয়ে হালকা।

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ

(ক) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ– ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) কঠিন স্নেহ এবং (২) তরল স্নেহ।

(১) **কঠিন স্নেহ–** যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে কঠিন আকৃতির হয় সেগুলোকে কঠিন স্নেহ বলে। যেমন–প্রাণীর চর্বি, মাখন ইত্যাদি।

(২) **তরল স্নেহ–** যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে সেগুলোকে তরল স্নেহ বলে। যেমন–সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

খ) উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ– উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়– (১) উদ্ভিজ্জ **স্নেহ** ও (২) **প্রাণিজ স্নেহ**।

(১) উদ্ভিজ্জ **স্নেহ–** যেসব স্নেহ পদার্থ উদ্ভিদ জগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে উদ্ভিজ্জ স্নেহ বলে। যেমন– নারিকেল তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

(২) **প্রাণিজ স্নেহ –** যেসব স্নেহ পদার্থ প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ স্নেহ বলে। যেমন– গরুর চর্বি, ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

খাদ্য উৎস

(১) **প্রথম শ্রেণির উৎস–** এখানে স্নেহের পরিমাণ ৯০% থেকে ১০০%। সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, সরিষার তেল, কড মাছের তেল বা হাঙর মাছের তেল ইত্যাদি।

(২) **দ্বিতীয় শ্রেণির উৎস–** এখানে স্নেহের পরিমাণ ৪০% থেকে ৫০%। বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন– চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি।

(৩) **তৃতীয় শ্রেণির উৎস–** এখানে স্নেহের পরিমাণ ১৫% থেকে ২০%। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি।

আমাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরির ২০% থেকে ২৫% স্নেহ পদার্থ থেকে গ্রহণ করা উচিত। ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য প্রয়োজনের চাইতে বেশি খেলে তা শরীরের কোনো কাজে লাগেনা এবং দেহে ফ্যাট আকারে জমা থাকে। যার ফলে দেহের ওজন খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। তাই ফ্যাটজাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন প্রকার ফ্যাটজাতীয় খাদ্য

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের কাজ–

১। স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ হলো তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ থেকে দেহে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

২। দেহে শক্তির উৎস হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

৩। কোষ প্রাচীরের সাধারণ উপাদান হিসেবে স্নেহ পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে-কে দ্রবীভূত করে দেহে গ্রহণ উপযোগী করে তোলে।

৫। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে সংরক্ষণের জন্য স্নেহ পদার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৬। দেহ হতে তাপের অপচয় রোধ করে শরীর গরম রাখে।

৭। স্নেহ পদার্থ চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

৮ । খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে।

ফ্যাটের অভাবে দেহে–

- প্রয়োজনীয় তাপশক্তির ঘাটতি হয়।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর ঘাটতি দেখা যায়।
- চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

কাজ ১– তুমি প্রতিদিন যে ফ্যাটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করো সেই খাবারগুলোর তালিকা করো।
কাজ ২– ফ্যাটজাতীয় খাদ্য তোমার শরীরে কী ধরনের কাজ করে তা লেখো।

পাঠ ৪– ভিটামিন

ভিটামিন হলো খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ যা জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আবার এদের উপস্থিতি ছাড়া জীবদেহের শক্তি উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয়, সুষ্ঠু স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এই যৌগগুলোর অভাবে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা যায়। দেহে এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোর চাহিদা খুব সামান্য। কিন্তু এর কাজকে সামান্য বলা যায় না। কারণ দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি কাজই ভিটামিনের উপস্থিতি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

ভিটামিনের শ্রেণিবিভাগ

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন– যে ভিটামিনগুলো চর্বিতে বা চর্বি দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় তাদেরকে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন ৪টি, যথা– এ, ডি, ই এবং কে।

(২) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন– যে ভিটামিনগুলো পানিতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু চর্বিতে অদ্রবণীয় তাকে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন প্রধানত দুই ধরনের।

যথা—ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স ও ভিটামিন–সি।

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স– ভিটামিন 'বি' কোনো একক ভিটামিন নয়। প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভিটামিনকে একসাথে ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স বলা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো থায়ামিন বা বি$_১$, রিবোফ্লাভিন বা বি$_২$, ফলিক এসিড।

ভিটামিনের উৎস

প্রাণিজ উৎস– সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য।

উদ্ভিজ্জ উৎস– ঢেঁকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু, বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাক, ধনেপাতা, লেটুস পাতা, বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন– ঢেঁড়স, মাশরুম, পেঁপে, চিচিংগা, লাউ, বেগুন, ধুন্দল, টমেটো, বিট। ওলকপি, ব্রোকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, বরবটি, মুলা, করলা, উচ্ছে, গমের অঙ্কুর, অঙ্কুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, কাঁচা কাঁঠাল, বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন- আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, আতা, সফেদা, গাব, বরই, কুল, জাম্বুরা, বেল, লেবু, পাকা টমেটো, কমলালেবু, কামরাঙ্গা, পাকা পেঁপে, আম, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদি।

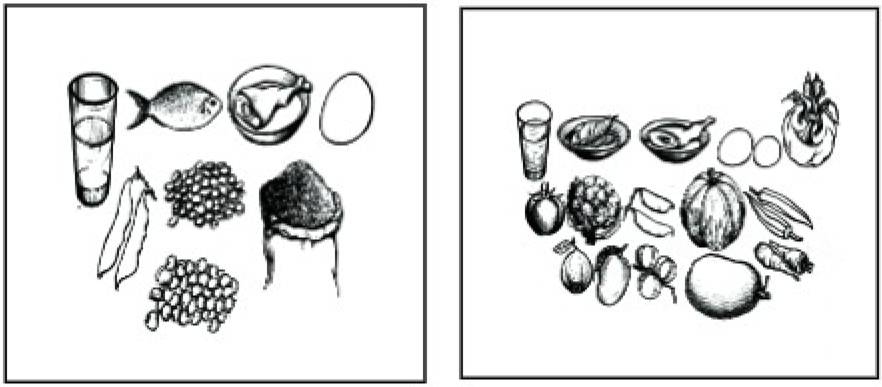

ভিটামিনসমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্য

ভিটামিনের কাজ

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।
- স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা ঠিক রাখে।
- চোখ ও ত্বকসহ বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।
- রক্ত গঠনে সাহায্য করে।
- শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখে।

অভাবজনিত রোগ– বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়।

যেমন–

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে বেরিবেরি, মুখে ঘা, ঠোঁটের কোনা ফেটে যাওয়া, পেলেগ্রা চর্মরোগ ও মানসিক বিষাদ, এনিমিয়া রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ

স্কার্ভি রোগ হয় (দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় ও স্পঞ্জের মতো হয় আর রক্ত পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ–

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন	**অভাবজনিত রোগ**
ভিটামিন- এ	রাতকানা রোগ হয় (রাতের বেলায় অল্প আলোতে দেখতে পায় না)।
ভিটামিন- ডি	শিশুদের রিকেট হয় (পায়ের হাড় বেঁকে যায় ও মাথার খুলি বড় দেখায়) এবং বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ (হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায় আর বেঁকে যায়)।
ভিটামিন- ই	প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

কাজ ১– বিভিন্ন ভিটামিনের খাদ্য উৎসের নাম লেখো।

পাঠ ৫– খনিজ লবণ বা ধাতব লবণ

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরই মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। দেহের উপাদানের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ৪ ভাগ অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, আয়োডিন, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘদিন খনিজ লবণের ঘাটতিতে নানা প্রকারের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। খাদ্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ পেয়ে থাকি।

শ্রেণি বিভাগ– পরিমাণের মাপকাঠিতে এদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) প্রধান খনিজ লবণ– অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও গন্ধক প্রাণী দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করে। এদের প্রধান খনিজ লবণ বলে।

(২) লেশ মৌল খনিজ লবণ– লৌহ, আয়োডিন, ক্লোরিন, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি খুব সামান্য পরিমাণ দেহের পুষ্টি কাজে অংশ নেয় বলে এসব মৌলকে লেশ মৌল খনিজ লবণ বলা হয়। কিন্তু এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ লবণের বিভিন্ন খাদ্য উৎস

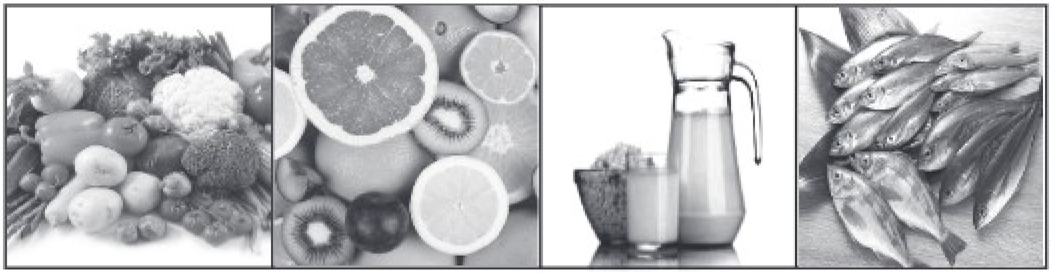

খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য

প্রাণিজ উৎস– সামুদ্রিক মাছ, কাঁটাসহ ছোট মাছ, ডিমের-কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য।

উদ্ভিজ্জ উৎস– বিভিন্ন ধরনের সবুজ সবজি ও ফল, ঢেঁকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

ধাতব লবণ বা খনিজ পদার্থের কাজ– আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলো আমাদের দেহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। নিচের ছকে এদের সাধারণ কাজগুলো দেওয়া হলো–

- কঠিন কোষকলা, যেমন–হাড় ও দাঁত গঠন করে
- রক্ত গঠন করে
- হরমোন গঠনে সহায়তা করে
- অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে

বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাবের ফল

বিভিন্ন প্রকারের খনিজ লবণের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন–

খনিজ পদার্থ	**অভাবজনিত রোগ**
ক্যালশিয়াম	ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয়, দাঁত ও হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়। শিশুদের রিকেট ও বড়দের ওস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়।
সোডিয়াম	রক্তচাপ কমে যায় ও পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
পটাশিয়াম	পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
আয়োডিন	গলগণ্ড রোগ হয়।
লৌহ	এনিমিয়া বা রক্ত-স্বল্পতা হয়।
জিংক	শিশুদের বর্ধন ব্যাহত হয়।

কাজ ১– খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য কেন গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করো।

পাঠ ৬– পানি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ কয়েক সপ্তাহ খাবার না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেয়ে এক দিনের বেশি থাকতে পারে না। মানুষের দেহ ৫৫% থেকে ৭৫% পানি দ্বারা গঠিত। শরীরের সকল টিস্যুতেই পানি থাকে। প্রতিদিন মল, মূত্র, ফুসফুস ও চামড়ার মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং মানুষের দেহ পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে না।

তাই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়। কী পরিমাণ পানি পান করতে হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের পরিশ্রম করা হচ্ছে, কী খাবার খাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় সেই পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। খাবার থেকে প্রায় ১ লিটার পানি পাওয়া যায় এবং বাকিটা তরল পানীয় থেকে পেতে হবে। গড়ে একজন মানুষের প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩ লিটার পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। খুব বেশি গরম আবহাওয়ায় ও অধিক পরিশ্রমে শরীরে পানি বেশি প্রয়োজন হয়। যারা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন তাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা উড়োজাহাজে ভ্রমণের জন্য প্রায় ১.৫ লিটার পানি বের হয়ে যায়।

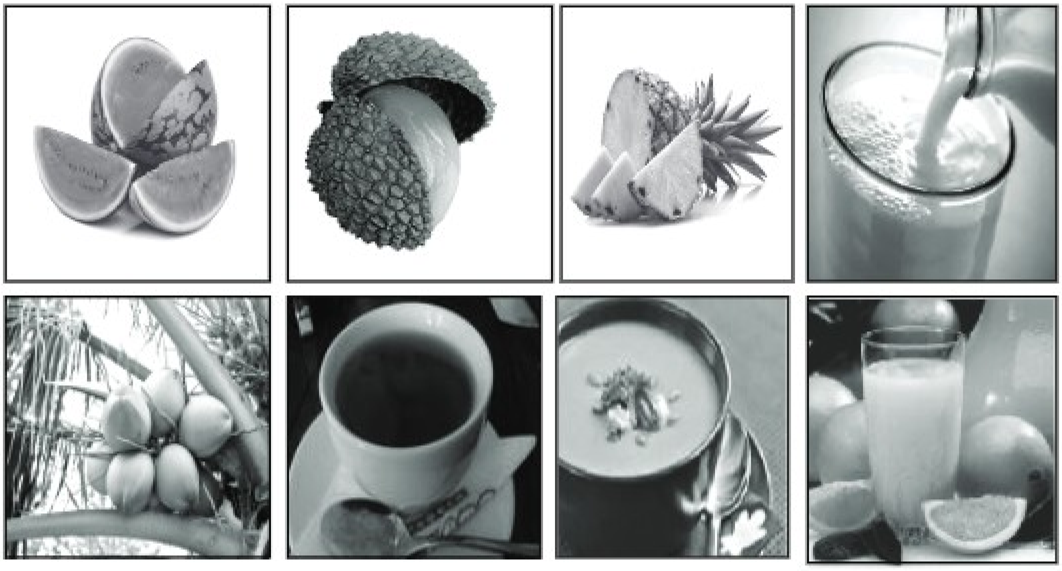

পানির বিভিন্ন খাদ্য উৎস

পানির উৎস– পানির প্রধান উৎস হচ্ছে খাবার পানি, ডাবের পানি, দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পানীয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রসালো ফল, যেমন– লিচু, জামরুল, তরমুজ ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

পানির কাজ

- শরীরের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কাজ বজায় রাখার জন্য পানির প্রায়োজন হয়।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য পানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।
- কোষে পুষ্টি উপাদান পরিবহণে সাহায্য করে।

শরীরে পানির পরিমাণ খুব কমে গেলে সেই অবস্থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি স্বল্পতা বলে। এর লক্ষণগুলো হলো মাথাধরা, দুর্বল লাগা, ঠোঁট শুকিয়ে যায় বা ফেটে যায়, মূত্রের রং গাঢ় হলুদ হয়। এই ডিহাইড্রেশনের কারণগুলো হলো–

- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, আর্দ্রতা, ব্যায়াম অথবা জ্বরের কারণে ঘাম বেশি হওয়া।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করা।
- ডায়রিয়া হওয়া।
- অতিরিক্ত বমি হওয়া।

কখন শরীরে পানির চাহিদা বাড়ে– দিনে ৬ থেকে ৮ গ্লাস পানির প্রয়োজন হয়। তবে পানির চাহিদা নিম্নলিখিত অবস্থায় বেড়ে যায়–

- খুব বেশি গরম আবহাওয়ার কারণে অনেক ঘাম হলে
- জ্বর হলে
- ডায়রিয়া হলে ও বমি হলে
- অনেক বেশি পরিশ্রম করলে, খেলাধুলা করলে বা ব্যায়াম করলে
- খাবারে আঁশজাতীয় খাদ্য বেশি থাকলে পানি বেশি খেতে হয়
- স্তন্যদাত্রী মায়ের পানির চাহিদা বেশি হয়

কাজ ১– কোন কোন অবস্থায় পানির চাহিদা বাড়ে?

পাঠ ৭ – খাদ্য পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজনীয়তা

আমরা খাবার খাওয়ার দৃশ্যটি চোখে দেখি। বাকি যে কাজগুলো শরীরের ভেতর ঘটে থাকে সেই ঘটনাগুলো আমরা চোখে না দেখলেও অনুভব করি। যেমন– খাবার খাওয়ার ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পর ক্ষুধা লাগে। খাবার পরিপাক হয়ে শোষিত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ক্ষুধা লাগে। আবার বেশ কিছুদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরে নানা প্রকার অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। এই বিষয়গুলো থেকে বুঝতে পারি যে, খাবার খাওয়ার পর শরীরের অভ্যন্তরে এমন কিছু কাজ ঘটে থাকে যার ফলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, আমরা সুস্থ থাকি, আমাদের ক্ষুধা লাগে এবং ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য আবার খাদ্য গ্রহণ করে থাকি।

তাহলে প্রশ্ন আসে, খাওয়ার পর শরীরের মধ্যে কী ঘটে এবং এর পরিণতিতে কী হয়? আমরা যে খাবারগুলো খাই, সেই খাবারের প্রতিটিতেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো জটিল অবস্থায় খাদ্যের মধ্যে অবস্থান করে। যে অবস্থায় পুষ্টি উপাদানগুলো খাদ্যের মধ্যে থাকে সেই অবস্থায় শরীরে কোনোভাবেই কাজে লাগতে পারে না বা দেহের পুষ্টিসাধন হয় না। যেমন – আমরা ভাত ও ডাল খেলাম। এই খাবারগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, ধাতব লবণ ইত্যাদি জটিল অবস্থায় থাকে। এই জটিল অবস্থায় ভাত বা ডাল সরাসরি শরীরে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং শরীরের কোনো কাজে আসবে না।

শরীরের গ্রহণ উপযোগী হতে হলে প্রথমে ভাত ও ডাল ভেঙে সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হবে। অর্থাৎ এদের মধ্যে অবস্থিত কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হবে, প্রোটিন ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত হবে, তারপর এই সরল উপাদানগুলো শোষিত হয়ে শরীরের পুষ্টি সাধন করবে। তাই খাবার খাওয়ার পর তা শরীরের উপযোগী অবস্থায় পরিণত করার জন্য বা গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করার জন্য এবং দেহের কোষগুলোতে পাঠাবার আগের পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজন হয়।

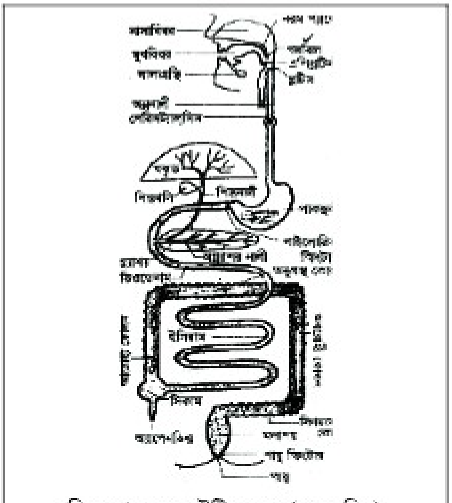

চিত্র- মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র (সরল চিত্র)

পরিপাক– খাবার খাওয়ার পর তা ভেঙে গিয়ে জটিল অবস্থা থেকে সরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পরিপাক বলে।

শোষণ– পরিপাক হওয়ার পর যে সরল উপাদানগুলো তৈরি হয় সেই উপাদানগুলো যে প্রক্রিয়ায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে।

পরিপাকতন্ত্র– মানবদেহের যে অঙ্গগুলো পরিপাক ও শোষণের কাজ করে থাকে তাদেরকে এক কথায় পরিপাকতন্ত্র বলে।

এই কাজগুলো আমাদের দেহের পরিপাকতন্ত্রে ঘটে থাকে। আমরা যে খাবারগুলো খাই সেগুলোতে পুষ্টি উপাদানগুলো জটিল অবস্থায় থাকে এবং এই জটিল অবস্থায় পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরে শোষিত হতে পারে না এবং কোনো কাজে আসে না। কিন্তু যখন খাবারগুলো পরিপাক হয় তখন জটিল পুষ্টি উপাদানগুলো ভেঙে গিয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়। সেই সরল উপাদানগুলো আবার শোষিত না হওয়া পর্যন্ত দেহে কোনো প্রকার কাজ করতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ (পুষ্টি উপাদানগুলো বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে জটিল অবস্থায় থাকে)

খাদ্য পরিপাক ⇨

খাদ্য সরল অবস্থায় পরিণত হয় (পুষ্টি উপাদানগুলো সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয়)

শোষণ ⇨

দেহের রক্তস্রোতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রক্ত থেকে বিভিন্ন কোষে পৌঁছে যায়

খাদ্য পরিপাক ও শোষণের পরিণতি

ওপরের ছক থেকে বলা যায় যে, জটিল পুষ্টি উপাদানগুলোকে সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করার জন্য পরিপাকের প্রয়োজন হয়। আবার পুষ্টি উপাদানগুলোকে দেহের কোষে কোষে পৌঁছানোর জন্য ও পুষ্টি সাধন করার জন্য শোষণের প্রয়োজন হয়।

কাজ ১– খাবার খাওয়ার পর দেহের অভ্যন্তরে যে প্রক্রিয়া ঘটে তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. খাদ্যের উপাদান কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি

২. বাড়ন্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কোনটি প্রয়োজন?

ক. কার্বোহাইড্রেট খ. প্রোটিন
গ. স্নেহ পদার্থ ঘ. খনিজ লবণ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো **এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রিতার বয়স আট বছর। সে শুধু সবজি দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করে। রিতা তার সমবয়সিদের সাথে খেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে। লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহ নেই। তার মা তাকে কোনো কাজ করতে বললে সেটি সে করতে চায় না। সব ব্যাপারে রিতার এ অনাগ্রহ তার পরিবারকে ভাবিয়ে তোলে।

৩. রিতার খাদ্যে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে?

ক. প্রোটিন খ. খনিজ লবণ
গ. কার্বোহাইড্রেট ঘ. পানি

৪. রিতার দৈনন্দিন খাদ্যে নিচের কোন তালিকাটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত–

ক. খেজুর, কিশমিশ, কলা, আনারস খ. ডাল, বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি
গ. তেল, ঘি, মাখন, নারিকেল ঘ. সামুদ্রিক মাছ, কলিজা, পনির, ডিমের কুসুম

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

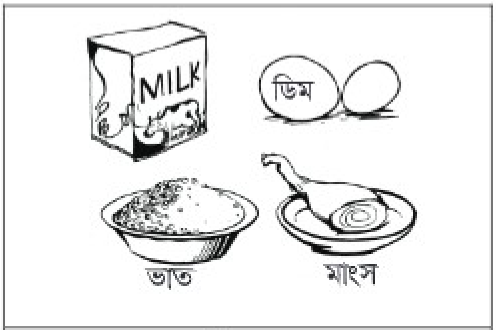

চিত্র–১

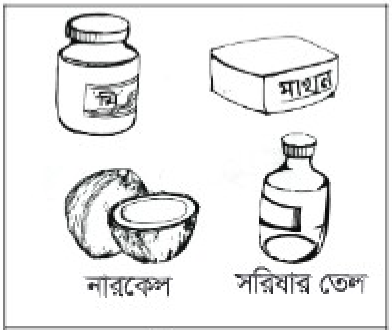

চিত্র– ২

ক. ভিটামিন কী?

খ. পরিপাকতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কী?

গ. ১ নং চিত্রের খাদ্যগুলো মানবদেহে কোন ধরনের কাজ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে করো ২ নং চিত্রের খাদ্যগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে গ্রহণের ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. দশ বছরের চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে তানহা। দুই থেকে তিন দিন হলো তার জ্বর ভালো হয়েছে। কিন্তু সে পড়ালেখা করতে পারছে না। অধিকাংশ সময় শুয়ে কাটায়। তার মা তাকে দুধ, পুডিং, সেমাই, কলিজা ও ডাল জাতীয় খাবার বেশি করে খেতে দেন।

ক. পরিপাক কী?

খ. ডায়রিয়া হলে শরীরে ডিহাইড্রেশন হয় কেন?

গ. মা তানহাকে যে খাদ্যগুলো খেতে বলে সেগুলো কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান?

ঘ. তানহার বর্তমান অবস্থা উত্তরণের জন্য মায়ের দেওয়া খাদ্যগুলো কতটুকু উপযোগী? ব্যাখ্যা করো।

নবম অধ্যায়

মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী

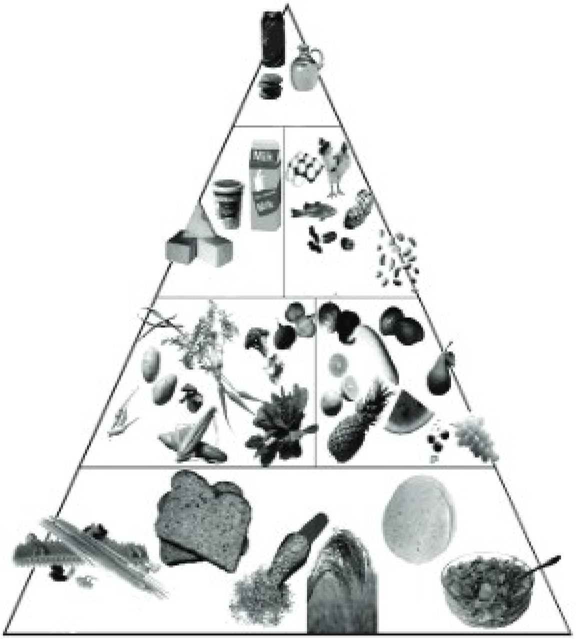

মৌলিক খাদ্যশ্রেণি

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই খাদ্য যদি সঠিক পরিমাণে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণ করা না হয় তা হলে শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন– খাবার যদি শরীরের চাহিদার চেয়ে বেশি খাওয়া হয় তা হলে শরীর মোটা হয়ে যাবে। আবার যদি শরীরের চাহিদার চেয়ে খাবার কম খাওয়া হয় তাহলে শরীর শুকিয়ে যাবে। এছাড়া একই খাদ্য যদি প্রতিদিন খাওয়া হয় তা হলে সেই খাবার কিছুদিন পরে আর খেতে ভালো লাগবে না। তাই প্রতিদিনের খাদ্য হওয়া চাই শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত, পুষ্টিকর ও একঘেয়েমিমুক্ত এবং রুচিকর। খাদ্যকে সুষম করতে হলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এই ছয়টি পুষ্টি উপাদানই উপযুক্ত অনুপাতে অর্থাৎ শরীরের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এসব খাদ্য উপাদান আবার বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। কোনো খাদ্যে একটা আবার কোনো কোনো খাদ্যে একাধিক পুষ্টি উপাদান থাকে। সুষম খাদ্য প্রস্তুত করতে হলে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে খাদ্য নির্বাচন করে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। তাই পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ খাদ্যগুলোকে কয়েকটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এই প্রতিটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্যগুলোতে পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতার পরিমাণ প্রায় একই। অর্থাৎ একটা খাদ্যশ্রেণিতে যে খাদ্যগুলো থাকে সেই খাদ্যগুলো থেকে প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যাবে, তাই একই শ্রেণির একটা খাদ্যের পরিবর্তে সেই শ্রেণির অন্য একটা খাদ্য খাওয়া যাবে। এতে করে পুষ্টির প্রাপ্যতা ঠিক থাকবে খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্যও আসবে। এভাবে খাদ্যের মৌলিক শ্রেণিগুলো থেকে খাদ্য গ্রহণের ফলে অতি সহজেই প্রতিটি খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যায়।

পাঠ ১ – মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর সজ্ঞা : দৈহিক পুষ্টি ও পরিশ্রমের জন্য প্রতিদিন খাদ্যের প্রয়োজন হয়। একজন সুস্থ-সবল ব্যক্তির কী পরিমাণ খাওয়া দরকার, কতটুকু খাবার খেলে শরীর সুস্থ রাখা যাবে, মোটা হওয়া রোধ করা যাবে, আবার শরীর শুকিয়ে যাবে না, খাদ্যদ্রব্যের কোনটি কী পরিমাণে গ্রহণ করলে দেহে খাদ্য উপাদানের অনুমোদিত চাহিদা পূরণ করা যায় তা নির্ণয়ের জন্য সমস্ত খাদ্যকে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। খাদ্যের উপাদান এবং দেহে খাদ্যের কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে সব শ্রেণির খাদ্যের সমন্বিত সুষম খাদ্য পরিকল্পনা করার জন্য খাদ্যসমূহকে কতগুলো মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এদেরকে মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী বা মৌলিক খাদ্যশ্রেণি বলে।

মৌলিক খাদ্যশ্রেণিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণের ফলে সহজে সুষম খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয়, এর ফলে দেহের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিসাধন ঘটে।

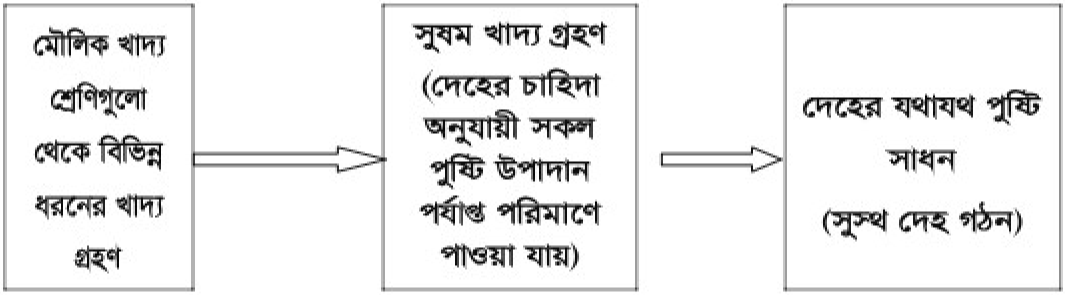

মৌলিক খাদ্য শ্রেণিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ

সুষম খাদ্য গ্রহণ (দেহের চাহিদা অনুযায়ী সকল পুষ্টি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়)

দেহের যথাযথ পুষ্টি সাধন (সুস্থ দেহ গঠন)

মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা

- খাদ্য সুষম হতে হলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি—এই ছয়টি পুষ্টি উপাদানই উপযুক্ত অনুপাতে খাদ্যে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তাই মৌলিক খাদ্যশ্রেণির মাধ্যমে খাদ্য নির্বাচন করে খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্য সহজেই সুষম হবে।
- মৌলিক খাদ্যশ্রেণি থেকে প্রতিদিনের খাদ্য নির্বাচন করলে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণে এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা সহজ হবে।
- খাদ্যকে একঘেয়েমি মুক্ত এবং রুচিকর করে পরিবেশন করার জন্য এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম।

খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে সুষম খাদ্য তালিকা তৈরির জন্য মৌলিক খাদ্য শ্রেণির গুরুত্ব রয়েছে।

কাজ ১– সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য মৌলিক খাদ্য শ্রেণির ভূমিকা লেখো।

পাঠ – ২ মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

পূর্বের পাঠে আমরা মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে জানব বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে কয়টি মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীতে বা মৌলিক খাদ্য শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে ৫টি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। নিচের ছকে এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্যগুলোর নাম এবং প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো –

নিচে মৌলিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত খাদ্যগুলোর নাম ও প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো দেওয়া হলো

মৌলিক খাদ্যশ্রেণি	**খাদ্যের নাম**	**প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান**
শস্য জাতীয় খাদ্যশ্রেণি (শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য-শ্রেণি)	ভাত, রুটি, সুজি, সেমাই, নুডলস্, আলু ইত্যাদি	খাদ্যশক্তি, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন বি$_{১}$, ভিটামিন বি$_{২}$
শাকসবজি ও ফল জাতীয় খাদ্যশ্রেণি (রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্যশ্রেণি)	বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফল ইত্যাদি	সেলুলোজ, ভিটামিন–বি, ভিটামিন–সি, ক্যারটিন, ফলিক এসিড, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ– ক্যালসিয়াম, লৌহ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি
মাছ, মাংস, ডাল ও বিচি জাতীয় খাদ্যশ্রেণি (দেহ গঠনকারী ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্যশ্রেণি)	ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ডাল বাদাম ইত্যাদি	খাদ্যশক্তি, প্রোটিন, ভিটামিন বি$_{১}$, ভিটামিন বি$_{২}$, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি$_{১২}$, ভিটামিন–এ, আয়রন, ক্যালসিয়াম
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি (শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শ্রেণি)	দুধ, দই, ছানা, ঘোল, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, ক্ষির, পায়েস ইত্যাদি	প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ল্যাকটোজ, ভিটামিন–এ, ভিটামিন বি$_{২}$, ভিটামিন বি$_{১২}$
স্নেহ বা তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যশ্রেণি	স্নেহ বা তেল-বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য তেল, ঘি, মাখন ডালডা ইত্যাদি মিষ্টি-চিনি, গুড় ও মিষ্টি জাতীয় খাবার	প্রধানত ঘনীভূত শক্তির বা ক্যালরির উৎস ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো পাওয়া যায়
 শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্যশ্রেণি		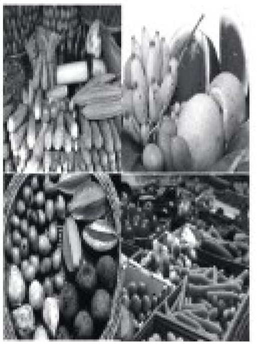 শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি
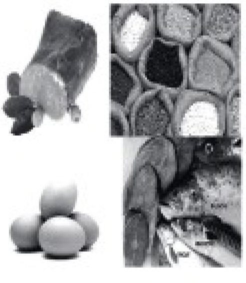 মাছ, মাংস, ডাল ও বিচি জাতীয় সমৃদ্ধ খাদ্যশ্রেণি	 স্নেহ ও মিষ্টিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি	 দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি

কাজ ১– তুমি গতকাল সারাদিনে যে খাবারগুলো খেয়েছ সেই খাবারগুলো কোন কোন মৌলিক খাদ্য শ্রেণিভুক্ত তা লেখো।

পাঠ ৩– পরিবেশন পরিমাণ

আমরা প্রতিদিন যে খাবারগুলো খাই, সেগুলোর পুষ্টিমূল্য হিসাব করার সুবিধার জন্য এবং দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি খাবার নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবেশন করা প্রয়োজন হয়। প্রতিটি খাবার পরিবেশনের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণের খাবার নির্ধারণ করা হয় তাকে এক পরিবেশন পরিমাণ খাদ্য বলা হয়। বিভিন্ন খাদ্যের জন্য এক পরিবেশন পরিমাণ ভিন্ন হয়।

১। শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্যশ্রেণি– শক্তি প্রদানকারী সমস্ত খাদ্যের মধ্যে শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য থেকেই আমরা মোট ক্যালরির অর্ধেকের বেশি পেয়ে থাকি। আমাদের প্রতিবেলার খাবারে শস্যজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকায় চাল, গম, আলু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সরবরাহ করে।

এক পরিবেশন শস্যজাতীয় খাদ্য	
খাদ্যের নাম	পরিমাণ
ভাত	১/২ কাপ
রুটি	মাঝারি ১টা
পাউরুটি	১ স্লাইস

শস্য জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ খাদ্য গ্রহণকারীর পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে। এই শ্রেণির খাদ্য গ্রহণ ক্যালরি চাহিদার ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এই শ্রেণি থেকে প্রতিবেলার খাবারে পরিশ্রমী ব্যক্তির একের অধিক পরিবেশন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি – উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় শাকসবজি ও ফল এই শ্রেণির খাদ্য। প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির দৈনিক ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম শাকসবজি ও ফলমূল গ্রহণ করা দরকার। প্রতিদিন তিন বেলার আহারে ৪ থেকে ৬ পরিবেশন শাকসবজি, ফল দেহের পরিপুষ্টির জন্য অপরিহার্য।

এক পরিবেশন শাকসবজি জাতীয় খাদ্য	
খাদ্যের নাম	পরিমাণ
কাঁচা শাকসবজি	৫০ গ্রাম
ফল	৫০ গ্রাম

প্রত্যেক পরিবেশনের পরিমাণ ভক্ষণযোগ্য কাঁচা শাকসবজি বা ফল কমপক্ষে ৫০ গ্রাম। বাকি ২ থেকে ৪ পরিবেশন অন্যান্য সবজি ও ফল থেকে গ্রহণ করা দরকার। এই শ্রেণির খাদ্য থেকে প্রতিবেলার খাবারে পরিশ্রমী ব্যক্তির একের অধিক পরিবেশন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩। মাছ, মাংস, ডাল ও বিচিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি– এই খাদ্যশ্রেণি থেকে দৈনিক ৬০ থেকে ১২০ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা যায়। আহারে প্রোটিন বহুল খাদ্য থেকে খাদ্য পরিবেশনের পরিমাণ

৩০ থেকে ৬০ গ্রাম। প্রতিদিন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন উভয় শ্রেণি থেকেই প্রয়োজনীয় প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত।

প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিবেশনের পরিমাণ	
খাদ্যের নাম	গ্রহণযোগ্য পরিমাণ
মাছ, ছোট বা বড়	৩০-৫০ গ্রাম
গরু বা খাসির মাংস	৩০-৫০ গ্রাম
হাঁসের বা মুরগির ডিম	১ টা
মসুর বা অন্যান্য ডাল	২৫ গ্রাম
চিনাবাদাম	২৫ "

দৈনিক কমপক্ষে এক পরিবেশন প্রাণিজ প্রোটিন আহারে থাকা বাঞ্ছনীয়। সন্তানসম্ভবা মা, প্রাকবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গামী শিশুর খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটিন অত্যাবশ্যক।

৪। দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি : শিশুদের জন্য এই শ্রেণির খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধই যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যে দুধ অপরিহার্য নয় তবে ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের জন্য দুধ ও দুধজাতীয় খাবার খুবই ভালো উৎস। শিশুদের পরিপূরক খাদ্যের সঙ্গে বয়স অনুপাতে দৈনিক ২০০ থেকে ৬০০ মিলিলিটার দুধের প্রয়োজন হয়। এক পরিবেশনে টাটকা তরল দুধের পরিমাণ ২০০ মিলিলিটার। বিদ্যালয়গামী শিশুরা দৈনিক কমপক্ষে এক পরিবেশন এবং বেশিরপক্ষে ২ পরিবেশন দুধ বা দুধে তৈরি খাবার গ্রহণ করলে তাদের উচ্চমানের প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও রিবোফ্লাভিনের চাহিদা পূরণ হয়।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য এক পরিবেশনের পরিমাণ		
খাদ্যের নাম	পরিমাণ	
টাটকা তরল দুধ	২০০ মিলিলিটার	১ গ্লাস
ছানা	৫০ গ্রাম	১/২ কাপ
দই	১০০ গ্রাম	১/২ কাপ
পনির	২৫ গ্রাম	২ টে. চামচ

৫। তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যশ্রেণি– স্নেহ বা তেল ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খুবই কম পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এই খাবারগুলো খুব বেশি পরিমাণে খেলে খুব তাড়াতাড়ি শরীরের ওজন বেড়ে যাবে। এজন্য রান্নায় যতটা সম্ভব কম পরিমাণে তেল ব্যবহার করা উচিত এবং মিষ্টিজাতীয় খাদ্য কম পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত।

কাজ– ১ তুমি প্রতিদিন যে খাবারগুলো গ্রহণ করো সেই খাবারগুলোর এক পরিবেশন পরিমাণ উল্লেখ করো।

পাঠ ৪ – সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর ব্যবহার

সুষম খাদ্য– দেহে যে ৬টি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন তা ৫টি শ্রেণির বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তির দেহের স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানবহুল যেসব খাদ্য যে পরিমাণে

গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য যে পরিমাণে গ্রহণ করলে কোনো ব্যক্তির দেহের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্য দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশক্তি, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও পানি সরবরাহ করে। সুষম খাদ্যে কোনো পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি বা আধিক্য থাকে না। মাছডাল, ভাতরুটি, শাকসবজি ও ফল, দুধ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য নিয়েই খাবার সুষম হয়।

সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যশ্রেণির ব্যবহার

১। খাবারে ৫টি মৌলিক শ্রেণির খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে ৬টি পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।

২। প্রত্যেক শ্রেণির খাদ্য পরিবেশন পরিমাণ জানা থাকায় খুব সহজেই পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য নির্বাচন করা যায়।

৩। দৈনিক মোট ক্যালরির ৫০% থেকে ৬০% কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য গ্রহণের জন্য শস্য ও শস্যজাতীয় খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণ গ্রহণ করা এবং ২০ গ্রাম গুড় বা চিনি জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা।

৪। দৈনিক মোট ক্যালরির ২০% প্রোটিনজাতীয় খাদ্য গ্রহণ ও দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক খাদ্যশ্রেণির মাছ, মাংস, ডাল ও বিচিজাতীয় খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করলে সহজেই খাদ্য সুষম হবে। এক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি কমপক্ষে এক পরিবেশন প্রাণিজ প্রোটিন নির্বাচন করতে হবে।

৫। দৈনিক মোট ক্যালরির ২০% থেকে ৩০% ফ্যাটজাতীয় খাদ্য থেকে পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তির জন্য দৈনিক মাথাপিছু ২০ থেকে ৩০ গ্রাম তেল (রান্নায়) গ্রহণ করা।

৬। ভিটামিন ও ধাতব লবণের দৈনিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফল প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশন নির্বাচন করতে হবে। এজন্য মৌলিক খাদ্যশ্রেণির শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি থেকে শাক, অন্যান্য সবজি রান্না করে এবং রঙিন সবজি রান্না করে এবং রঙিন ফল, টকজাতীয় ফল, রসাল ফল ইত্যাদি মিশ্রিত করে গ্রহণ করতে হবে।

শস্যজাতীয় খাদ্যশ্রেণি	শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি	মাছ, মাংস, ডাল ও বিচি জাতীয় সমৃদ্ধ খাদ্যশ্রেণি	দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি	তেল ও মিষ্টিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি
৫টি খাদ্যশ্রেণি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন				

সুষম খাদ্য পরিকল্পনা

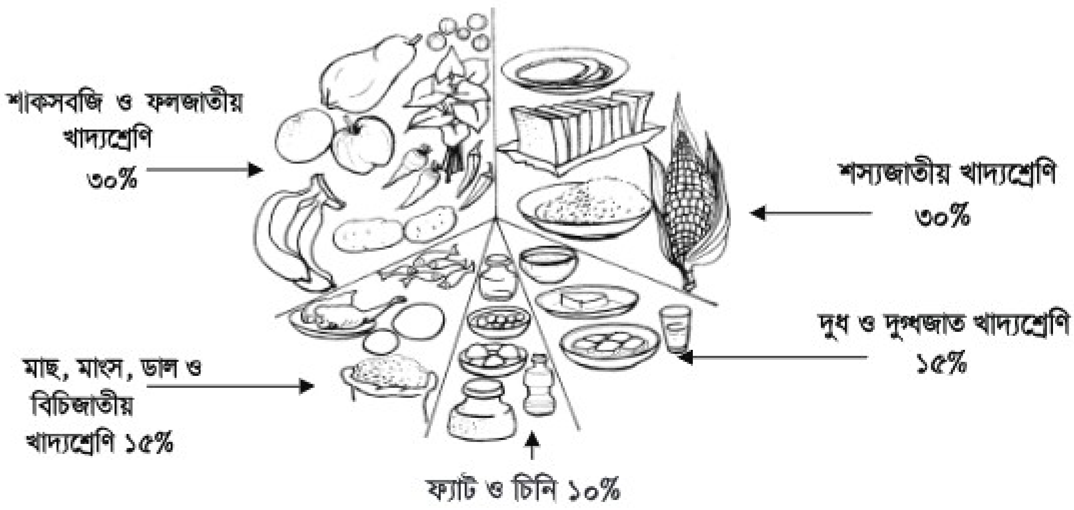
শাকসবজি ও ফলজাতীয় খাদ্যশ্রেণি ৩০%
শস্যজাতীয় খাদ্যশ্রেণি ৩০%
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যশ্রেণি ১৫%
মাছ, মাংস, ডাল ও বিচিজাতীয় খাদ্যশ্রেণি ১৫%
ফ্যাট ও চিনি ১০%

শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য, চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ক্যালরি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য, চাহিদার চেয়ে খাওয়া যাতে কম বা বেশি না হয় সেজন্য এবং অপুষ্টি প্রতিহত করার জন্য সুষম আহার গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের এক দিনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা

পরিবারের সদস্যদের সুষম আহার পরিবেশনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত। পরিবারের এক দিনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করার সময় মৌলিক ৫টি খাদ্যশ্রেণি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া পরিবারের সকল বয়সের সদস্যদের জন্য উপযোগী খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। একই খাদ্য বারবার গ্রহণ করলে খাদ্য গ্রহণে অনীহা ও অরুচি তৈরি হয়, তাই একটা খাদ্যশ্রেণি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিমাণ ঠিক রেখে খাদ্য নির্বাচন করলে খাদ্য গ্রহণে বৈচিত্র্য আসবে এবং খাদ্য সুষম হবে।

কাজ ১– পাঁচটি মৌলিক খাদ্যশ্রেণি ব্যবহার করে নিচের ছকে পরিবারে এক দিনের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করো।

প্রাতরাশ (সকালের নাশতা)	মধ্যাহ্ন ভোজ (দুপুরের খাবার)	নৈশ ভোজ (রাতের খাবার)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণের ভালো উৎস–

ক. মাছ খ. দুধ ও দুধজাতীয় খাবার
গ. বাদাম ঘ. ডাল

২. নিম্নের খাদ্যগুলোর মধ্যে কোন খাদ্য থেকে সেলুলোজ পাওয়া যায়?

ক. গরুর মাংস খ. লাউশাক
গ. চিনাবাদাম ঘ. ভুট্টার খই

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৩ বছর বয়সি নাফিস ডাল দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করে। মাছ ও মাংস খেতে চায় না বললেই চলে। দুধ কিংবা দুধজাতীয় খাবারের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই।

৩. নাফিসের দেহে নিচের কোনটির অভাব দেখা দেবে?

ক. আয়োডিন খ. রিবোফ্লাভিন
গ. সুক্রোজ ঘ. স্টার্চ

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত খাদ্যাভ্যাসের ফলে নাফিসের–

i. ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগে ভুগবে
ii. অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগবে
iii. মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হবে

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

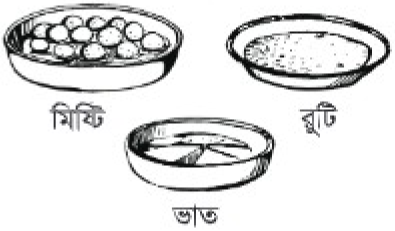

চিত্র–১

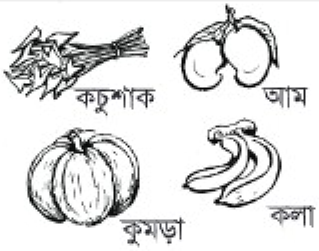

চিত্র–২

ক. বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকে কয়টি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়?
খ. দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় কেন?
গ. ১ নং চিত্রের খাদ্যগুলো থেকে আমরা কী ধরনের পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকি– ব্যাখ্যা করো।
ঘ. দেহের পুষ্টিসাধনে ২ নং চিত্রের খাদ্যগুলোর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো ।

২.

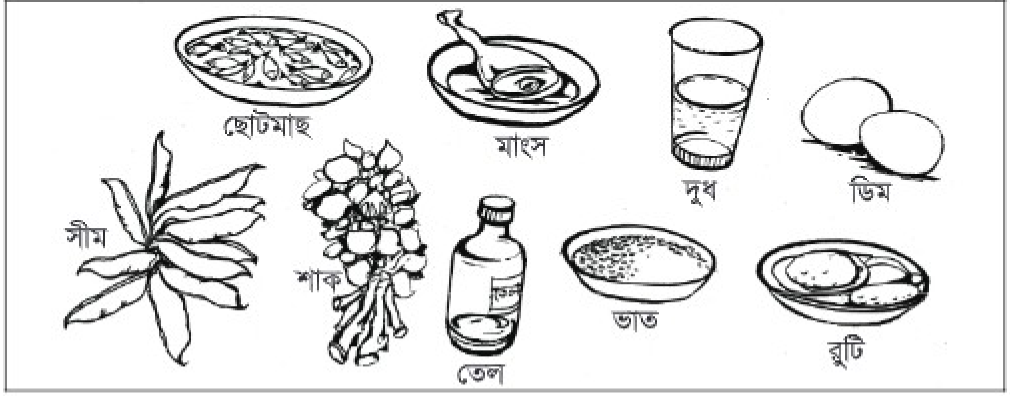

ক. দৈনিক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে কতটুকু গুড় বা চিনি না থাকলে ক্যালরির ঘাটতি হয়?
খ. শস্যজাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের মোট ক্যালরির কতটুকু পূরণ করে? বুঝিয়ে লেখো।
গ. চিত্রের খাদ্যগুলো ব্যবহার করে ১৩ বছর বয়সি একজন ছাত্রীর দুপুরবেলার খাদ্য পরিকল্পনা করো।
ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত খাদ্যগুলো পরিবারের সকল সদস্যের শরীরের চাহিদা অনুযায়ী ক্যালরি সরবরাহ নিশ্চিত করে- তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

রোগীর পথ্য ও পথ্য পরিকল্পনা

পাঠ ১ – রোগীর পথ্য

পথ্য কী? স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থাতে খাদ্য গ্রহণে সাধারণত কোনো ধরনের বিধিনিষেধ থাকে না। কিন্তু কোনো কোনো রোগের কারণে শরীরে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যার ফলে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো বিশেষ নির্দেশনা থাকতে পারে। কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণে বিধিনিষেধ হতে পারে। এমনকি খাদ্যে কোনো বিশেষ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজনও হতে পারে। কোনো রোগে আক্রান্ত হলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠার জন্য বা রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করা হয় তাকে পথ্য বলে। যেমন– ডায়রিয়া হলে যে বিশেষ নির্দেশনা মেনে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাকে ডায়রিয়ার পথ্য বলা হবে।

অসুস্থ অবস্থা	→ **ওষুধের পাশাপাশি সঠিক পথ্য গ্রহণ করা** →	**রোগের কারণে জটিলতা হয় না ও তাড়াতাড়ি শরীর সুস্থ হয়ে উঠে**
অসুস্থ অবস্থা	— **ওষুধের পাশাপাশি সঠিক পথ্য গ্রহণ না করা** →	**রোগের কারণে জটিলতা বাড়ে ও শরীর সুস্থ হয়ে উঠতে দেরি হয়**

পথ্যের গুরুত্ব

(১) যথাযথ পথ্য গ্রহণ ছাড়া শুধু ওষুধ সেবনে অধিকাংশ রোগ থেকেই স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ পথ্য ছাড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

(২) রোগের জটিলতা ও তীব্রতা কমিয়ে আনার জন্য যথাযথ পথ্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) রোগের কারণে শরীরের যে সকল পুষ্টি ও শক্তির ক্ষয় হয় সেই সকল ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে।

পথ্য নির্বাচন ও পরিকল্পনা– যে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পথ্য নির্বাচন ও পরিকল্পনার সময় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে–

- রোগের প্রকৃতি বা ধরন– রোগটি কোনো সংক্রমণ জনিত রোগ, নাকি বিপাকজনিত রোগ অথবা দীর্ঘমেয়াদী বা তীব্র কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।
- রোগের কারণে রোগীর দেহে কোনো জটিলতা তৈরি হয়েছে কিনা।
- রোগীর বয়স – শিশুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ রোগীর চাইতে পথ্যের ধরনে পার্থক্য থাকতে পারে। আবার প্রাপ্তবয়স্কের থেকেও বৃদ্ধ রোগীর পথ্যের ধরনে পার্থক্য থাকতে পারে।
- রোগের কারণে খাদ্য গ্রহণে বিধি নিষেধ রয়েছে। যেমন– কোনো কোনো রোগের কারণে আঁশজাতীয় খাবার কম খেতে বলা হতে পারে।

- চিকিসার জন্য নির্দেশিত ওষুধ গ্রহণের সাথে খাদ্যের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন– ডায়াবেটিস রোগের- কারণে যারা ইনসুলিন নেন তাদের জন্য ইনসুলিন গ্রহণের কারণে খাবারের সময়, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ থাকে।
- বিশেষ কোনো রোগে বিশেষ কোনো পুষ্টি উপাদানের গ্রহণ বৃদ্ধি বা কমানোর প্রয়োজন রয়েছে। যেমন– উচ্চ রক্তচাপ হলে খাবারে লবণের পরিমাণ কমাতে বলা হয়।
- অপুষ্টিজনিত সমস্যা থাকলে তার অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন– কোনো রোগীর রক্তস্বল্পতা থাকলে তার পথ্য পরিকল্পনার সময় যে খাবার খেলে শরীরে রক্ত গঠনের জন্য সহায়ক হবে সেই খাবারগুলো খাদ্য তালিকায় যুক্ত করতে হবে।
- কোনো বিশেষ খাদ্যে এলার্জি বা খাদ্যের কারণে রোগীর জটিলতা তৈরির আশঙ্কা আছে কি না।

যেকোনো রোগে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে একজন রোগীর জন্য পথ্য নির্বাচন ও পরিকল্পনা করলে তা রোগ সারাতে বা রোগের কারণে সৃষ্ট জটিলতা উপশমে সহায়ক হবে। একজন অসুস্থ হলে ডাক্তার যেমন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন তেমনি অসুস্থ রোগীকে পথ্যবিদ বা পুষ্টিবিদ পথ্য ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশনা দিয়ে রোগ সারাতে সহায়তা করে থাকেন।

কাজ ১– তোমার বাসায় কেউ অসুস্থ হলে তুমি তার পথ্য পরিকল্পনার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে?

পাঠ ২– বিভিন্ন রোগের পথ্য

জ্বর ও ডেঙ্গু জ্বরে পথ্য– জ্বর নিজে কোনো রোগ নয় তবে সাধারণত কোনো ভাইরাস বা অন্য কোনো সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগলক্ষণ হিসেবে জ্বর হয়। জ্বরে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এর সাথে মাথাব্যথা, মাথাধরা, অরুচি, বমি বমি ভাব ও বমি ইত্যাদি লক্ষণ থাকতে পারে। জ্বরে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়, এছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে শক্তির ক্ষয় হয়। তাই জ্বর হলে পানি ও শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগলে পানি ও শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও বেড়ে যায়। ডেঙ্গু জ্বর এডিস মশার মাধ্যমে সংক্রমিত ভাইরাসজনিত জ্বর। ডেঙ্গু জ্বর হলে দেহের তাপমাত্রা অনেক বেশি হতে পারে। যেকোনো জ্বরের মতো ডেঙ্গু জ্বরেও শরীরের জন্য পানি ও শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়। সেই সাথে প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা বাড়ে।

পথ্যের ধরন

- উচ্চ শক্তিদায়ক, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত, কম ফ্যাটযুক্ত খাবার দিতে হবে।
- সব খাবারই খাওয়া যাবে। তবে হজমে সমস্যা হলে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা বেশি হলে অল্প আঁশযুক্ত খাদ্য নরম করে রান্না করে ভাত, খিচুড়ি বা পিশপাশ, নরম ও অল্প আঁশযুক্ত সবজি, আলু দেওয়া যায়। এছাড়াও নরম সুজি, পুডিং এবং কলা, পেঁপে, কমলা, আপেল ইত্যাদি দেওয়া যায়।
- প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য দুধ, ডিম, কম তেলযুক্ত মাছ, মুরগি ও ডাল দেওয়া যায়। ডেঙ্গু জ্বর হলে প্রোটিনের চাহিদা বেড়ে যায়।
- যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় যেমন–দুধ, শরবত, ফলের রস, ডাবের পানি, সুপ ইত্যাদি খেতে হবে।
- টকজাতীয় ফল যেমন - আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি দিতে হবে।
- জ্বর বেশি হলে ২ থেকে ৩ ঘন্টা পরপর অল্প অল্প করে খাবার দিতে হবে।

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত

- মাখন, ঘি ও বেশি তৈলাক্ত খাদ্য।
- ডিপ ফ্রায়ড খাবার যেমন– সিংগারা, সমুচা, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার ও আঁশযুক্ত খাদ্য।
- বেকারির খাবার যেমন– পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট্ ড্রিংকস।

ডায়রিয়া ও আমাশয়ে পথ্য– খাবার ও পানির মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রে জীবাণুর সংক্রমণের ফলে ডায়রিয়া ও আমাশয় হয়ে থাকে। শিশুরাই আক্রান্ত হয় বেশি। তবে বড়রাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ডায়রিয়া হলে পাতলা মল নির্গত হয়, সাথে জ্বর, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা ও বমি থাকতে পারে। যেহেতু এই রোগের কারণে পরিপাকতন্ত্র সরাসরি আক্রান্ত হয় ও পাতলা পায়খানার কারণে শরীর থেকে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, তাই পথ্য পরিকল্পনায় অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। আমাশয় হলে নরম থেকে পাতলা মল নির্গত হয় এবং মলের সাথে মিউকাস এবং কখনো কখনো রক্ত নির্গত হয়। এক্ষেত্রে পেট কামড়ানোর মতো ব্যথা অনুভূত হয়।

পথ্যের ধরন

- ডায়রিয়া হলে পাতলা পায়খানার কারণে শরীরে পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণ করার জন্য প্রতিবার পায়খানার পর খাওয়ার স্যালাইন দিতে হবে। প্রয়োজনে চালের গুঁড়ার স্যালাইন রান্না করে খেতে দিতে হবে। এতে করে প্রয়োজনীয় পানি ও লবণের ঘাটতি খুব সহজেই পূরণ হবে। স্যালাইন না খেলে ডায়রিয়াজনিত কারণে ডিহাইড্রেশন হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।
- যেসব শিশু মায়ের দুধ খায় তারা কোনো অবস্থাতেই মায়ের দুধ খাওয়া বন্ধ করবে না, বরং মায়ের দুধের পাশাপাশি স্যালাইন চলবে।
- ডায়রিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ খুব বেশি না হলে স্বাভাবিক খাবার খাওয়া যাবে এবং পাশাপাশি স্যালাইন ও ওষুধ খেতে হবে।

- ডায়রিয়ার প্রকোপ খুব বেশি হলে অর্থাৎ তীব্র হলে স্বাভাবিক খাবার দেওয়া বাদ দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই চালের গুঁড়ার স্যালাইন রান্না করে খেতে দিতে হবে। অন্যান্য খাবারের মধ্যে খুব নরম ভাত, ডিমের সাদা অংশ, কলা, ডাবের পানি দেওয়া যাবে।
- কাঁচা কলা ও পাকা কলা আমাশয়ের ও ডায়রিয়ার রোগীর জন্য ঔষধি সবজি ও ফল হিসেবে পরিচিত। এগুলো আমাশয় ও ডায়রিয়ায় উপকারি ভূমিকা পালন করে। এছাড়া থানকুনির পাতায় আমাশয়ের রোগীর জন্য ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে।

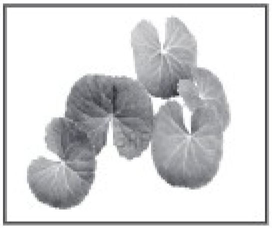
থানকুনি পাতা

চালের গুঁড়ার স্যালাইন

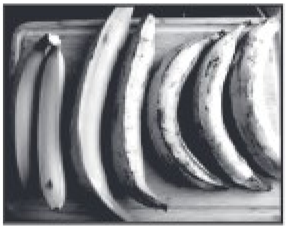
কাঁচা কলা ও পাকা কলা

ডাব

ডায়রিয়ায় যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত

- এক্ষেত্রে দুধ, তৈলাক্ত খাদ্য, ডাল, বাদাম, খুব বেশি আঁশযুক্ত শাকসবজি ও ফল, এছাড়াও শুকনা ফল, মিষ্টি ও মসলাযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
- সফট্ ড্রিংকস, ফলের ঘন রস।
- ডিপ ফ্রায়েড খাবার যেমন– সিংগারা, সমুচা, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন– পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।

কাজ ১– কেউ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সর্বপ্রথম তুমি কী খাওয়ার জন্য বলবে এবং কেন বলবে?

পাঠ ৩– উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে পথ্য

উচ্চ রক্তচাপে পথ্য– অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, বংশগত কারণ, ওজনাধিক্য, বিপাকীয় ত্রুটি ইত্যাদি কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। ওষুধের পাশাপাশি যথাযথ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখা এবং নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করাই উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার অর্থাৎ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায়।

পথ্যের ধরন

- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন–ফল ও শাকসবজি বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন–লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- কচি ডাবের পানি উপকারী।

- ভাত ও রুটি এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না। সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও গমের ভুঁসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারী।
- মাছ, চর্বিছাড়া মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাওয়া যাবে।
- ডাল, বাদাম খাওয়া যাবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।

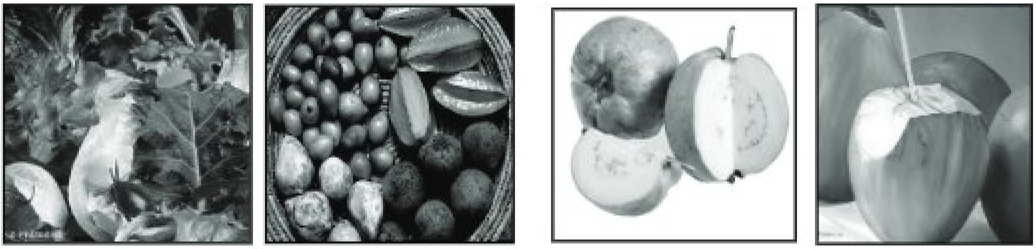

উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীর জন্য উপকারী খাদ্য

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত

- বেশি লবণযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে। যেমন– পনির, আচার-চাটনি, সস, চিপস্, চানাচুর ইত্যাদি।
- লবণে সংরক্ষিত যেকোনো খাবার, যেমন– নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- মাখন, ঘি, ডালডা, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- চর্বিযুক্ত মাংস ও এদের তৈরি খাদ্য।
- ফাস্ট ফুড যেমন– চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন– বিস্কুট, পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট্ ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে এবং সয়াসস, চায়নিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, আর নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিডনি নষ্ট হওয়া, স্ট্রোক হওয়া ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

ডায়াবেটিসে পথ্য– বংশগত কারণ, অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন ইত্যাদি কারণে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের অভাব ঘটলে ডায়াবেটিস হয়। একবার ডায়াবেটিস হলে তা একেবারে সেরে যায় না, তবে নিয়ম মেনে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনোভাবেই ডায়াবেটিস

নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। ডায়াবেটিস হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই গ্লুকোজ প্রধানত খাবার থেকে আসে। কিছু কিছু খাবার আছে যা খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেই খাবারগুলো পরিহার করতে হবে। আবার কিছু খাবার আছে খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ না বাড়লেও সেই খাবারগুলো পরিমাণে বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই সেই খাবারগুলো হিসাব করে খেতে হবে। আবার যে খাবারগুলোতে প্রচুর আঁশ আছে সেই খাবারগুলো বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না, তাই সেগুলো বেশি করে খাওয়া যাবে।

পথ্যের ধরন

- **বেশি খাওয়া যাবে বা ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে–** সব রকমের শাকসবজি যেমন– চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, পেঁপে, পটল, শিম, লাউ, শসা, খিরা, করল্লা, উচ্ছে, কাঁকরোল, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি। ফলের মধ্যে জাম, জামরুল, আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি।
- **হিসাব করে খেতে হবে–** ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, খৈ, বিস্কুট, আলু, মিষ্টিআলু, মিষ্টিকুমড়া, দুধ, ছানা, পনির, মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম, মিষ্টি ফল যেমন– কলা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারি। ডায়াবেটিসে দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় না।
- **পরিহার করতে হবে–** চিনি, গুড়, মিছরি, রস, শরবত, সফট্ ড্রিংকস, জুস, সব রকমের মিষ্টি, পায়েস, ক্ষীর, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি।

ডায়াবেটিক রোগীর জন্য উপকারী খাদ্য

কাজ ১– ডায়াবেটিস হলে যে খাবারগুলো রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় সেগুলোর একটা তালিকা করো।
কাজ ২– হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিসের রোগীদের কী ধরনের চাল ও আটা খাওয়ার পরামর্শ দেবে?

পাঠ ৪– হৃদ্‌রোগ ও জন্ডিসে পথ্য

হৃদ্‌রোগে পথ্য– আমাদের দেশে দিনদিনই হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হৃদ্‌রোগীর খাদ্য এমন হতে হবে যাতে করে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তির চাইতে বেশি খাদ্যশক্তি গৃহীত না হয় ও খাদ্য সুষম হয়। খাদ্যের মাধ্যমে চিনি, লবণ ও ফ্যাটের গ্রহণ যেন কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা হয়।

পথ্যের ধরন

- লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না।
- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন– ফল ও শাকসবজি বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন– লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।
- বিভিন্ন রঙিন সবজি যেমন– সবুজ (শাকপাতা), কমলা (মিষ্টিকুমড়া/গাজর), বেগুনি (বিট), লাল (টমেটো), হালকা হলুদ–সাদা (মুলা, শসা) রঙের এবং মৌসুমি তাজা শাকসবজি প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- ডাল, বাদাম পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।
- মাছ, চর্বিছাড়া মাংস, চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া ভালো।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।

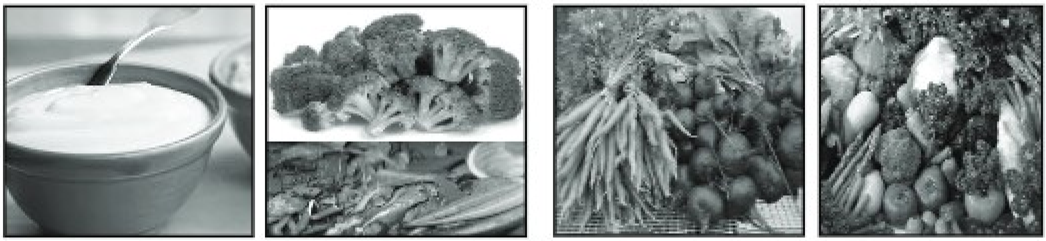

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য উপকারী খাদ্য

যে খাবারগুলো বাদ দেওয়া উচিত

- মাখন, ঘি, ডালডা, ক্রিম সস, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য
- আইসক্রিম, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি
- বেশি চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, হাঁস-মুরগির চামড়া ও এদের তৈরি খাদ্য
- বেশি লবণযুক্ত বা লবণে সংরক্ষিত যেকোনো খাবার, যেমন– পনির, আচার, চাটনি, সস, সয়াসস, চিপস্, চানাচুর, লবণযুক্ত বাদাম, নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি
- ফাস্ট ফুড যেমন– চিকেন ফ্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি

- বেকারির খাবার যেমন–বিস্কুট, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি
- সফট্ ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে
- স্বাদ লবণ (টেস্টিং সল্ট) বাদ দিতে হবে।

জন্ডিসে পথ্য– জন্ডিস নিজে কোনো রোগ নয় তবে এটা লিভারের কোনো রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণ প্রকাশ পেলে সেই ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনযুক্ত এবং কম পরিমাণ ফ্যাটযুক্ত পথ্য দিতে হবে। জন্ডিসে অনেকেরই হজমের সমস্যা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। হজমের কোনো সমস্যা না থাকলে উচ্চ চর্বি বা ফ্যাটযুক্ত খাবার পরিহার করে বাকি সব ধরনের খাবার খাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন জন্ডিস হলে হলুদযুক্ত তরকারি খাওয়া যায় না, এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। আবার অনেকে জন্ডিস হলে স্বাভাবিক খাবার একেবারে বন্ধ করে দিয়ে শুধু আখের রস, পানি আর শরবত দিয়ে থাকেন-এটাও সঠিক নয়। জন্ডিসে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে তবে চর্বিযুক্ত খাদ্য ও কৃত্রিম খাদ্যগুলো পরিহার করে সব খাবারই প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়া যাবে। নিচে জন্ডিস রোগীর পথ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

পথ্যের ধরন

- উচ্চ শক্তিদায়ক, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত, কম চর্বি বা ফ্যাটযুক্ত খাবার দিতে হবে।
- জন্ডিসে সব খাবারই খাওয়া যাবে। তবে হজমে সমস্যা হলে লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- হজমে সমস্যা হলে নরম ভাত, খিচুড়ি বা পিশপাশ, নরম ও অল্প আঁশযুক্ত সবজি, পেঁপে, আলু ইত্যাদি দেওয়া যায়। এছাড়া সুজি, নরম পুডিং এবং ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, কমলা, আপেল ইত্যাদি দেওয়া যায়।
- প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য দুধ, ডিম, কম তেলযুক্ত মাছ, মুরগি ও ডাল দেওয়া যায়।
- যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় যেমন– দুধ, শরবত, ফলের রস, ডাবের পানি, সুপ ইত্যাদি খেতে হবে।
- টকজাতীয় ফল যেমন– আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি দিতে হবে।

পরিহার করতে হবে

- মাখন, ঘি, চর্বি ও বেশি তৈলাক্ত খাদ্য।
- ডিপ ফ্রায়েড খাবার যেমন সিংগারা, সমুচা, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন– পেস্ট্রি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট্ ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস।

কাজ ১– হৃদ্‌রোগীর জন্য বর্জনীয় খাবারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
কাজ ২– জন্ডিস হলে কোন খাবার বাদ দিতে হবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন রোগের কারণে ডিহাইড্রেশন হয়?

ক. উচ্চ রক্তচাপ　খ. জ্বর
গ. ডায়রিয়া　ঘ. ডেঙ্গু

২. ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে কোনটি উপযোগী?

ক. ডাল　খ. বাদাম
গ. শিম　ঘ. মিষ্টিকুমড়া

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো **এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

খাবারের প্রতি রিমোর অরুচি ও বমি বমি ভাব লক্ষ করে রিমোর মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন রিমোর চোখ ও প্রস্রাবের রং হলুদ হয়েছে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তিনি তখন রিমোর জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করেন।

৩. রিমোর কোনো রোগটি হয়েছে?

ক. ডায়রিয়া　খ. জন্ডিস
গ. আমাশয়　ঘ. ডায়াবেটিস

৪. রিমোর জন্য উপযুক্ত পথ্য কোনগুলো?

ক. শরবত, ফলের রস ও ডাবের পানি　খ. সিংগারা, সমুচা ও চিকেন ফ্রাই
গ. মাছ, মাংস ও ডিম　ঘ. বিস্কুট, কেক ও সফ্‌ট ড্রিঙ্কস

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. পুষ্পার শাশুড়ি বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ। তিনি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পুষ্পা তার শাশুড়িকে প্রয়োজনীয় সব ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে তিনি শাশুড়ির আবদার রক্ষার জন্য ক্ষীরের পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করে খেতে দেন। পুষ্পার স্বামী তা দেখে পুষ্পাকে তাঁর মায়ের খাবারের প্রতি আরও সচেতন হতে বলেন।

ক. পথ্য কী?
খ. পথ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।
গ. পুষ্পার তৈরি করা খাবারটি শাশুড়ির উপর কীরূপ প্রভাব ফেলবে, ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উপযুক্ত পথ্য পুষ্পার শাশুড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে–উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

একাদশ অধ্যায়

খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যাতে পচে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুদ রাখা।

বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত শাকসবজি, ফলমূল, শস্য যেমন– চাল, গম, ডাল, সরিষা ইত্যাদি চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অংশ অবিকৃত অবস্থায় দীর্ঘ দিন খাওয়ার উপযোগী রাখার জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অর্থাৎ শাকসবজি, ফলমূল, শস্যদানা ইত্যাদি খাওয়ার বা বিক্রির জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়। ভবিষ্যতের জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্যসামগ্রীকে নষ্ট করা বা অপচয় করা থেকে রক্ষা করে রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

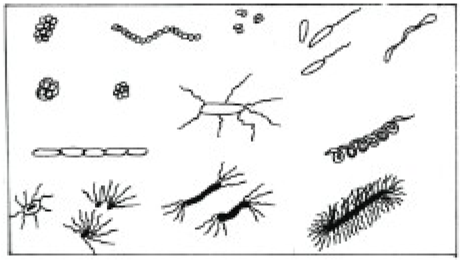

১. অনুজীব

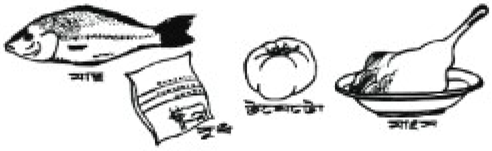

২. দ্রুত পচনশীল খাদ্য

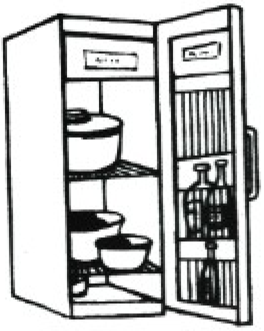

৩. ফ্রিজ

পাঠ ১– খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শস্য মানুষের প্রধান খাদ্য বলে অনেকদিন পর্যন্ত কেবল শস্যই সংরক্ষণ করা হতো। ফ্রিজ, হিমাগারের মতো প্রযুক্তি উন্নতির সাথে সাথে আজ ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদিও সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যেসব খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় সেগুলো হলো–

- শস্য ও শস্য জাতীয় খাদ্য।
- সবজি, ফলমূল এবং সবজি ও ফলের তৈরি খাদ্য।

- মাছ ও মাংস এবং মাছ ও মাংসের তৈরি খাদ্য।
- দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য।

খাদ্য সংরক্ষণের ধরন নির্ভর করে খাদ্যের পচনশীলতা প্রকৃতির উপর। তাই দ্রুত পচনশীল, প্রায় পচনশীল এবং অপচনশীল খাদ্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এখন আমরা খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা জেনে নেই—

- সংরক্ষণের মাধ্যমে এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমের জন্য সংরক্ষণ করে খাদ্যের চাহিদা ও অভাব মিটানো যায়।
- ঋতুকালীন সবজি ও ফল সংরক্ষণ করে অপচয় রোধ করার পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি মেটানো যায়।
- সংরক্ষণের মাধ্যমে সারাবছর ধরে বিভিন্ন মৌসুমের শস্য, শাকসবজি, ফলমূল সহজলভ্য করা সম্ভব।
- দেশের সব অঞ্চলে সব ধরনের খাদ্যশস্য, সবজি, ফলমূল উৎপন্ন হয় না। যথাযথ উপায়ে শস্য–ফলমূল, সবজি সংরক্ষণ করে সারা দেশে সরবরাহ করা সম্ভব।
- খাদ্য সংরক্ষণ করা হলে খরা, মহামারি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদেরকে খাদ্যের অভাব, অপুষ্টি থেকে রক্ষা করা যায়।
- এছাড়া যুদ্ধ কিংবা অন্য কোনো কারণে অস্থিতিশীলতার সময় সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি, দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।
- মাছ-মাংস, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্য টিনে সংরক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

কাজ ১– খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ২– পচনশীলতার ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

কৃষক রজব আলী জীবন ও জীবিকার তাগিদে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের ফসল যেমন– ধান, ডাল, গম, আলু, সরিষা, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, জিরা, ধনে ইত্যাদি চাষ করেন। বিভিন্ন মৌসুমে আবাদ করেন টমেটো, আনারস, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি বাহারি ফল। বছর জুড়েই মরিচ, শাকসবজি, ফলমূল ফলান। এছাড়া খামারে গরু ও হাঁস মুরগি পালন করেন, পুকুরে চাষ করেন মাছ। উৎপাদনকালীন এসব খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণের অভাবে ও পচনশীলতার কারণে এক সময় আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে। ফলে মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে পরিবারের ন্যূনতম চাহিদা ও মেটানো সম্ভব হয় না।

তাই পচনশীলতার ধরন যাচাই করে উপযুক্ত উপায়ে এসব খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করা দরকার। যাতে সারাবছর এই খাদ্যগুলো দিয়ে নিজেদের চাহিদা মেটানো যায়।

সংরক্ষণ যোগ্য সব খাদ্যবস্তুকে পচনশীলতার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

ক) দ্রুত পচনশীল বা সহজে পচনশীল খাদ্য
খ) প্রায় পচনশীল খাদ্য
গ) অপচনশীল খাদ্য

ক) দ্রুত পচনশীল বা সহজে পচনশীল খাদ্য

কোনো কোনো খাদ্য অতিদ্রুত অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পচন ধরে নষ্ট হয়। এসব খাদ্যে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। সেজন্য যত্ন না নিলে খুব দ্রুত পচে যায়। যেমন– মাছ, মাংস, দুধ, টমেটো, শাক ইত্যাদি। দ্রুত পচনশীল খাদ্য ফুটিয়ে, রেফ্রিজারেটরে রেখে বা বরফে জমিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

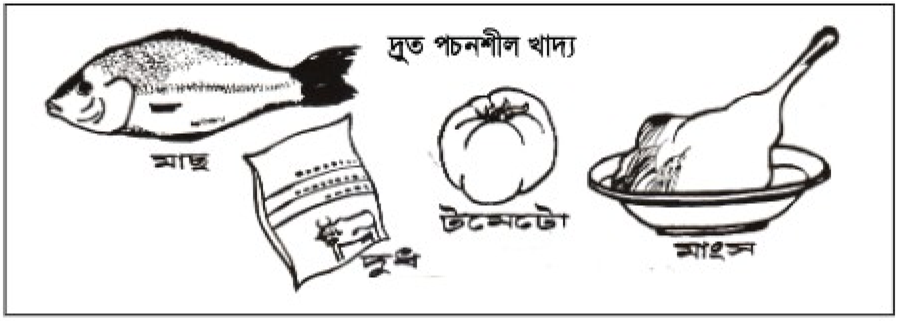
দ্রুত পচনশীল খাদ্য

খ) প্রায় পচনশীল খাদ্য–

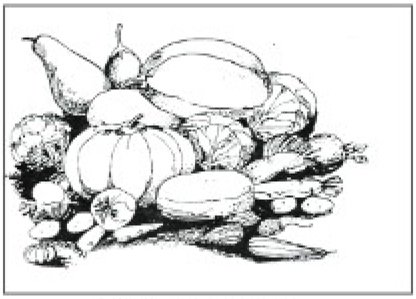
প্রায় পচনশীল খাদ্য

কোনো কোনো খাদ্য স্বাভাবিক অবস্থায় রেখেও কয়েক দিন ধরে খাওয়া যায়। কিছু সবজি যেমন – চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, কচু, আলু ইত্যাদি, কিছু কিছু ফল যেমন– চালতা, পেয়ারা, বড়ই, জলপাই ইত্যাদি এবং ডিম, আদা, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি। এগুলোতে দ্রুত পচনশীল খাদ্যের চেয়ে পানির পরিমাণ কিছু কম থাকে বলে ঘরের ঠান্ডা আবহাওয়া, তাপ ও আলো থেকে দূরে রেখে কয়েক দিন ব্যবহার করা যায়।

গ) অপচনশীল খাদ্য

চাল, ডাল, গম, শুকনা মরিচ, হলুদ, জিরা, সরিষা ইত্যাদি খাদ্যগুলোতে পানির পরিমাণ নেই বললেই চলে সঠিকভাবে এই খাদ্যগুলোকে ঝেড়ে বেছে, রোদে শুকিয়ে উপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ করা হলে অনেকদিন ধরে খাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকার মসলা

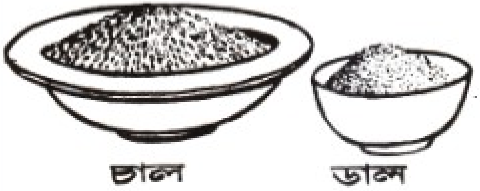

অপচনশীল খাদ্য

কাজ ১– দ্রুত পচনশীল ও অপচনশীল খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩– খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ

কোনো খাদ্যই স্বাভাবিকভাবে অনেকদিন ধরে ঘরে রাখা যায় না। যেমন–ফল, সবজি নরম হয়ে যায়, খোসা কুঁচকে যায়, কালো দাগ পড়ে, চিতি পড়ে, দুর্গন্ধ বের হয় ইত্যাদি। মাছ, মাংস পচে নষ্ট হলে উপরিভাগ পিচ্ছিল হয়। পচা মাছের চোখ ঘোলা হয়ে বসে যায়, পেটের নাড়িভুঁড়ি গলে যায় ফলে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে পেট ভেতরে বসে যায়, আঁশ ঢিলা ও কানকা ফ্যাকাসে হয়। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ডিমও নষ্ট হয়। শুকনো খাদ্য, চাল, ডালে ছত্রাক জন্মায় এবং পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। একইভাবে রান্না করা খাদ্যে গাঁজন হয়, বুদ্‌বুদ ওঠে, টক গন্ধের সৃষ্টি হয়। তাই ঘরে রাখতে হলে খাবারকে পচনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর সেজন্যই খাবার কেন নষ্ট হয় সে সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা দরকার।

খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১) অণুজীব

আমাদের চারদিকে বাতাসে, মাটিতে ও পানিতে ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট, মোল্ড বা ছত্রাক ইত্যাদি অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে আছে। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। অণুজীবের বেঁচে থাকা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন খাদ্য, পানি, তাপ ও অক্সিজেন। সুযোগ পেলেই এগুলো খাদ্যে প্রবেশ করে এবং অনুকূল পরিবেশে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়ে খাদ্য দূষিত হয় এবং পচে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

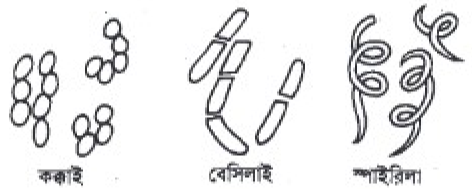

ব্যাকটেরিয়া

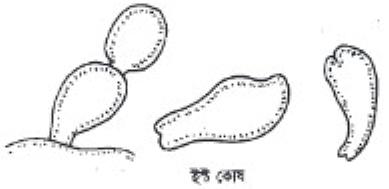

ইস্ট

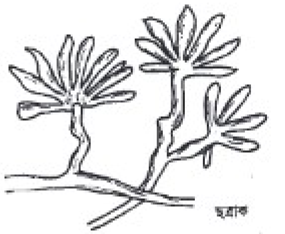

ছত্রাক

উল্লেখযোগ্য অণুজীবগুলো হচ্ছে–

ক) ব্যাকটেরিয়া– ব্যাকটেরিয়া এককোষী জীব। মাছ-মাংস, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় এবং খাদ্য পচিয়ে ফেলে। আর্দ্রতায় ব্যাকটেরিয়া খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার জন্য উচ্চতাপ প্রয়োজন। শুষ্ক পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি লোপ পায়।

খ) ইস্ট– ইস্ট হচ্ছে এককোষ বিশিষ্ট অণুজীব যা পানি ও বাতাসের উপস্থিতিতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যকে নষ্ট করে। ইস্টের প্রভাবে শর্করা গেঁজো অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। ইস্ট বাতাসের অভাবে বাঁচতে পারে না। উত্তাপ দিয়ে ইস্ট মেরে ফেলা যায়।

গ) ছত্রাক– ছত্রাক একজাতীয় উদ্ভিদ। উত্তাপ, আর্দ্রতা এবং বাতাসের উপস্থিতিতে কমলা, আম টমেটো, পনির, পাউরুটি, টক জাতীয় খাবারের উপর ছত্রাক জন্মায়। খাবারের উপর ছত্রাক ধূসর সবুজ বর্ণের আস্তরণ তৈরি করে। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে শস্য ও চীনাবাদামে এক ধরনের বিষাক্ত ছত্রাক জন্মায় যা খেলে দেহে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। পানি ও আর্দ্রতায় ছত্রাক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, ঠান্ডা ও আলোযুক্ত স্থানে ও উচ্চ তাপে ছত্রাক জন্মায় না। রোদের তাপে ছত্রাক ধ্বংস হয়।

২) এনজাইম– এনজাইম উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের উপাদান। উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে এনজাইম অনুঘটকের কাজ করে। এনজাইম ফল ও সবজি পাকাতে সাহায্য করে। এনজাইমের প্রভাবে ফল অতিরিক্ত পেকে নরম ও বোঁটাচ্যুত হয়। এভাবে থেতলানো ফল জীবাণুর আক্রমণে কালচে বর্ণ ধারণ করে। বিকৃত গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়। তাপ যত কম থাকে এনজাইমের কাজ তত কম হয়। ৮০° সে.-এর অধিক তাপে খাদ্য বস্তুকে উত্তপ্ত করলে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়।

৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া– ফল ও সবজির রাসায়নিক উপাদান ‘এসিড’ ও ‘ট্যানিন’ বাতাস ও পানির সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন হয় এবং খাদ্য নষ্ট

হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ করতে হলে ০° সে. তাপমাত্রায় ফলমূল সংরক্ষণ করা ভালো। খাদ্য শুকিয়ে পানি সম্পূর্ণরূপে বের করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া রোধ হয়। বোতলে বায়ুশূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে ফলমূল সংরক্ষণ করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া কম ঘটে।

৪) **সংরক্ষণের অনুপযুক্ত স্থান** – সংরক্ষণকৃত শুকনো খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে যথাস্থানে রাখা না হলে ধুলা-ময়লা, ইঁদুর, পোকামাকড়ের আক্রমণে খাদ্যবস্তু আক্রান্ত হয়। পরবর্তী সময়ে জীবাণু ও ছত্রাক জন্মায় এবং খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়।

কাজ ১– খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলো।

পাঠ ৪ – গৃহে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

আমরা প্রকৃতি থেকে যে খাদ্যগুলো পাই সেগুলো সবই পচনশীল। পচন ক্রিয়ার ফলে মানুষের উৎপাদিত খাদ্যসমূহ অনেকাংশে নষ্ট হয়। এই নষ্ট হওয়াকে রোধ করার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার। আমরা বিভিন্নভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি।

কুল, বরই, আম শুকিয়ে রাখা, নোনা ইলিশ, বিভিন্ন মাছের ও মাংসের শুঁটকি ইত্যাদি আমাদের দেশে প্রচলিত অতি পুরাতন সংরক্ষণ পদ্ধতি। এসব সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে মূলত খাদ্য থেকে পানি শুকিয়ে পচন রোধ করা হয়।

গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে–

- এক মৌসুমের খাদ্য অন্য মৌসুমে খাওয়ার জন্য।
- উৎপাদিত বাড়তি খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য।
- খাদ্যে জীবাণু ও এনজাইমের ক্রিয়া বন্ধ করা।
- খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রেখে খাদ্যের চাহিদা মেটানো।

গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি

রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ– মাছ-মাংস ও টাটকা শাকসবজির পানি প্রাকৃতিক উপায়ে রোদে শুকিয়ে নিতে পারলে পচন রোধ করা যায়। অনেকদিন ভালো থাকে। আলু, গাজর, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, কুল, বরই, আম, মাছ, মাংস সঠিক নিয়মে রোদে শুকিয়ে নিলে অনেক দিন খাওয়া যায়।

মাছ কীভাবে শুকাব

রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ

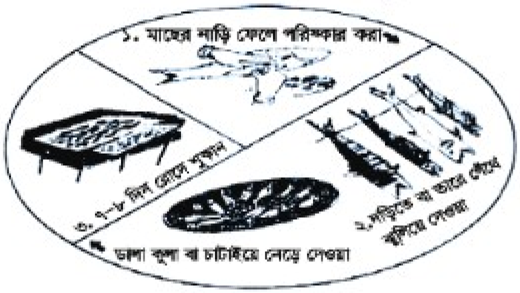
১. মাছের নাড়ি ফেলে পরিষ্কার করা
২. শলিতে বা তারে গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া
ডালা কুলা বা চাটাইয়ে মেলে দেওয়া
৩. ৭–৮ দিন রোদে শুকানো

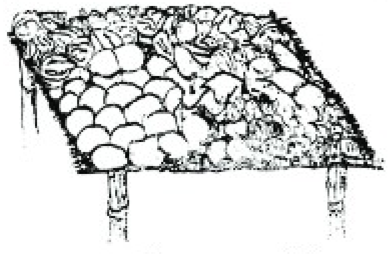

মাচায় আলু, পেঁয়াজ, রসুন বিছিয়ে রাখা

গুড় ও চিনিতে সংরক্ষণ– গুড়, চিনি খাদ্য সংরক্ষক দ্রব্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। গুড়ের সিরায় বরই, তেঁতুল, আম ইত্যাদি অনেকদিন রেখে খাওয়া যায়। চিনি দিয়ে চালকুমড়া, আম, বেল ইত্যাদির মোরব্বা বানিয়ে অনেকদিন খাওয়া যায়। স্বাদ-গন্ধ ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়।

সিরকা ও তেলে সংরক্ষণ– সিরকার ও তেলে সবজি ও ফলমূল এবং মসলা সংরক্ষণ করা যায়। সিরকা বা ভিনেগার খাদ্যে জীবাণু বৃদ্ধি রোধ করে। যেমন– সবজি বা ফলের পিকেলস। হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনে ইত্যাদি মসলা দিয়ে তেলে ডোবানো আচার অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে।

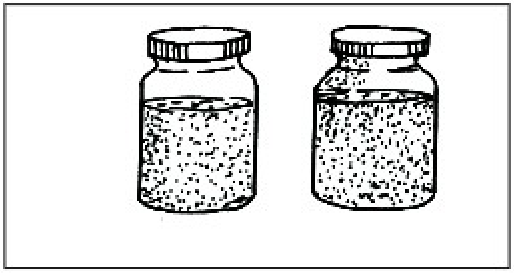

গুড় ও চিনিতে সংরক্ষণ (জেলি, মিষ্টি আচার)

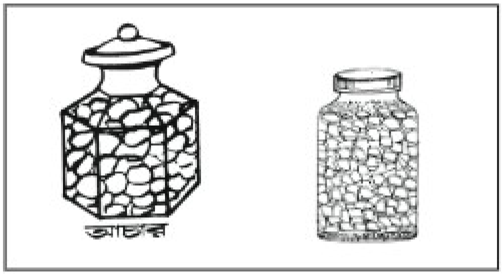

সিরকা ও তেল সংরক্ষণ

লবণে সংরক্ষণ– লবণের দ্রবণ জীবাণু বৃদ্ধি রোধে বিশেষ উপযোগী।

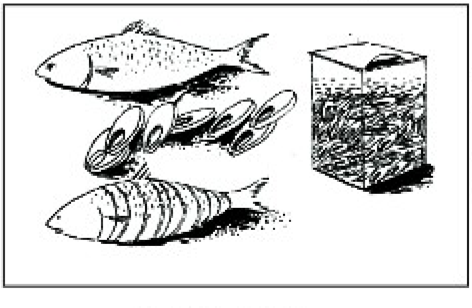

লবণে সংরক্ষণ

খাদ্যে লবণ মাখলে জীবাণু কোষ থেকে পানি শুকিয়ে যায়। যেমন– ইলিশ মাছের কাটা টুকরা লবণ মাখিয়ে নোনা ইলিশ তৈরি হয়। কাঁচা আম, চালতা, আমলকী লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে অনেকদিন রাখা যায়।

বরফে সংরক্ষণ– তাজা, টাটকা শাকসবজি পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে পলিথিনে মুড়ে ফ্রিজে রাখা হয় এবং যাতে ঘেমে না পচে সেজন্য পলিথিন ব্যাগে দুচারটি ফুটো করে দিতে হয়। তবে ফ্রিজের নিচের তাপমাত্রা

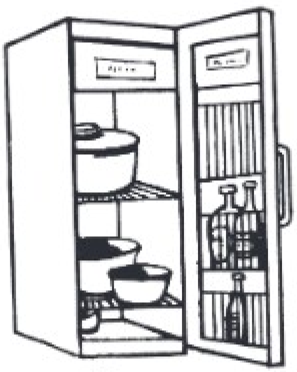

ফ্রিজ

৪৫° ফা. -এর বেশি না হয়। ফ্রিজের যে চেম্বারে খাবার জমে বরফে পরিণত হয় তাকে ফ্রিজার বলে। এর তাপমাত্রা ১৮° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর যে চেম্বারে খাবার বরফে পরিণত হয় না কিন্তু ঠান্ডা থাকে তাকে রেফ্রিজারেটর বলে। এই রেফ্রিজাটরের তাপমাত্রা ২° থেকে ৬° সে. পর্যন্ত হয়। দ্রুত পচনশীল খাদ্য যেমন– মাছ-মাংস, দুধ প্রভৃতি ফ্রিজারে রেখে দীর্ঘদিন রেখে খাওয়া যায়।

কাজ ১– খাদ্য সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা সাধারণত কত সে. পর্যন্ত হয়?

ক. ২° সে থেকে ৪° সে. খ. ৪° সে. থেকে ৬° সে.
গ. ৬° সে. থেকে ৮° সে. ঘ. ২° সে. থেকে ৬° সে.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো **এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

খালেক মিয়া একজন ফল ব্যবসায়ী। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আম এনে বিক্রি করেন। এবার রাজশাহী থেকে আনা আমগুলো প্যাকিং ভালো না হওয়ায় অধিকাংশ আমই বিক্রির অনুপযোগী হয়ে যায়।

২. উদ্দীপকের ফলগুলো বিক্রয়ের অনুপযোগী হওয়ার জন্য দায়ী

i. ব্যাকটেরিয়া
ii. ছত্রাক
iii. এনজাইম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. **রাজশাহী থেকে আনা আমগুলো–**

ক. অ্যালকোহল সৃষ্টির জন্য সহায়ক খ. কালচে বর্ণ ধারণ করে
গ. এসিডের বিক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায় ঘ. পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

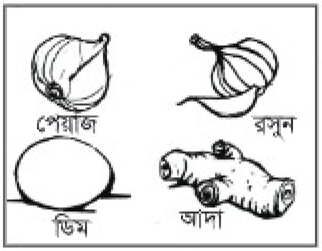

চিত্র–১

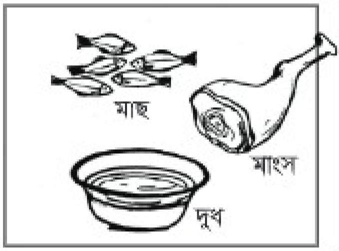

চিত্র–২

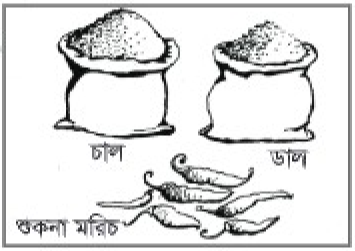

চিত্র–৩

রমজান মাস এসে পড়ায় সুমাইয়া মাসিক ও সাপ্তাহিক বাজারের তালিকায় চিত্রের উল্লিখিত তিন প্রকার খাদ্যদ্রব্য রাখেন। বাজার থেকে ফিরে তিনি ২ নং চিত্রের খাদ্যগুচ্ছকে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ১ নং ও ৩ নং চিত্রের খাদ্যগুচ্ছকে পরে গুছিয়ে রাখবেন বলে ঘরের একপাশে রেখে দেন।

ক. কীরূপ পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি লোপ পায়?
খ. খাবারের উপর ছত্রাক ধূসর সবুজ বর্ণের আস্তরণ তৈরি করে– বুঝিয়ে লেখো।
গ. সুমাইয়ার ২ নং চিত্রের খাদ্যগুচ্ছের সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের ১ নং ও ৩ নং চিত্রের খাদ্যগুলোকে স্বাভাবিকভাবে অনেক দিন ধরে রাখা সম্ভব কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঘ বিভাগ

বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন তন্তু

প্রতিটি তন্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণির তন্তুগুলোর গুণাগুণ ও ব্যবহারবিধি ভিন্ন ভিন্ন হয়। তন্তুর গুণাগুণ জানা থাকলে বিভিন্ন তন্তু দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রকে ডাইং, প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় আরও আকর্ষণীয় করা যায়। এছাড়া স্থান-কাল-পাত্রভেদে সঠিক তন্তুর বস্ত্র সঠিক স্থানে ও পরিচ্ছন্নভাবে নির্বাচন করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো যায়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারব।
- গঠনমূলক ও সজ্জামূলক নকশার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- বস্ত্র অলংকরণে ডাইং, প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারির পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গঠনমূলক জামায় বিভিন্ন প্রকার অলংকরণের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করতে উৎসাহী হবে।
- ব্যক্তিত্ব ও রুচি প্রদর্শনে পোশাকের পারিপাট্য বজায় রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব।
- পোশাক পরিচ্ছন্নতার ধাপ বর্ণনা করতে পারব।

দ্বাদশ অধ্যায়

বয়ন তন্তুর গুণাগুণ

পাঠ ১– প্রাকৃতিক তন্তুর গুণাগুণ

(ক) তুলাতন্তুর (সুতি কাপড়ের) গুণাগুণ

তুলাতন্তু

সুতি কাপড়ের তন্তুগুলো আসে তুলা থেকে। অল্প দৈর্ঘ্যের তুলাতন্তু অপেক্ষা বেশি দৈর্ঘ্যের তুলা তন্তুর কাপড় বেশি সুন্দর ও টেকসই হয়। মোটা ও ছোট তন্তু হতে নিকৃষ্ট ও মোটা জাতীয় কাপড় তৈরি করা হয়। তুলাতন্তু দ্বারা তৈরি সুতি কাপড়ে সহজে ভাঁজ পড়ে, কম উজ্জ্বল হয়, তাপ সুপরিবাহী হয় এবং এর শোষণক্ষমতা ভালো হওয়ায় সব ঋতুতে ব্যবহার করা যায়। সুতিবস্ত্রের যত্ন নেওয়া সহজ। মাড় প্রয়োগ করা যায়। উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য সাদা বস্ত্রে নীল দেওয়া যেতে পারে এবং ইস্ত্রি করার সময় বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় না। সাবান, সোডা, গরম পানি ইত্যাদি দিয়ে ধোয়া যায়। ধোয়ার সময় ঘষা ও রগড়ানো যায়। তুলাতন্তুর মূল্য তুলনামূলকভাবে কম, তাই পোশাক ছাড়াও এই তন্তুর তৈরি বস্ত্র বিছানার চাদর, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, মশারি, লেপ, সোফার কাপড়, ন্যাপকিন, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি কম ব্যয়বহুল হয়।

(খ) ফ্ল্যাক্সতন্তুর (লিনেন কাপড়ের) গুণাগুণ

লিনেন বস্ত্র উৎপাদন হয় ফ্ল্যাক্সতন্তু থেকে। আর ফ্ল্যাক্সতন্তুর উৎপত্তি হচ্ছে তিসি বা মসিনা গাছ (Flax) থেকে। এর উজ্জ্বলতা রেশমের মতো নয়, তবে তুলার তুলনায় উজ্জ্বল হয়। তুলাতন্তু অপেক্ষা দুই থেকে তিন গুণ বেশি শক্তিশালী, ভেজালে এ শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। পানি শোষণ ক্ষমতাও তুলার চেয়ে ভালো। তবে এরূপ বস্ত্রে সহজে ভাঁজ পড়ে।

ফ্ল্যাক্সতন্তু

ফ্ল্যাক্সতন্তু দিয়ে সূক্ষ্ম সুতা ও মসৃণ লিনেন বস্ত্র তৈরি করা যায়, যা বেশ চকচকে, মজবুত ও ঠান্ডা। বিভিন্ন রং প্রয়োগ করে এদের সৌন্দর্য আরও বাড়ানো যায়। এরূপ বস্ত্র পরিধানে আরাম বোধ হয়। এই তন্তু সমতলভাবে অবস্থান করে এবং সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে। তাই টেবিল কভার, বিছানার চাদর, রুমাল,

পর্দা, পরিধেয় ও গৃহস্থালি বস্ত্র হিসেবেও এর জনপ্রিয়তা অনেক। পানি শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকায় লিনেন বস্ত্র গরমের দিনের পোশাকের জন্য বেশ আরামদায়ক।

কাজ ১– সুতি ও লিনেন বস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো।

(গ) **রেশমতন্তুর গুণাগুণ–** রেশম প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড়, উজ্জ্বল ও মোলায়েম প্রাণিজ তন্তু। গুটি পোকার লালা থেকে এটা উৎপাদিত হয়। রেশমতন্তুর বস্ত্রে সহজে ভাঁজ পড়ে না। সূর্যালোকে রেশম দুর্বল হয়। অধিক তাপে সাদা রেশম হলুদ রং ধারণ করে। রেশম তন্তু তাপের ভালো পরিবাহী নয়, তাই গ্রীষ্মকালে পরিধান করলে গরম বেশি লাগে। সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষারীয় পদার্থে রেশম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ বস্ত্রে শুষ্ক অবস্থায় সহজে তিলা বা ছোট ছোট দাগ পড়ে না। সহজে সংকুচিত হয় না। রং ধারণ ক্ষমতাও ভালো, তবে ঘামে এ তন্তুর বেশ ক্ষতি হয়। রেশমি বস্ত্র সুতি ও লিনেনের চেয়ে ওজনে হালকা। এর বহুমুখী ব্যবহার উপযোগিতার কারণে শার্ট, ব্লাউজ, ছেলে ও মেয়েদের পোশাক, সজ্জামূলক উপকরণের উপযোগী বস্ত্র ইত্যাদি এ তন্তু থেকে তৈরি করা হয়। রেশমি বস্ত্র দামি তবে যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেকদিন স্থায়ী হয়।

গুটিপোকা

(ঘ) **পশমতন্তুর গুণাগুণ–** পশম একটি প্রাণিজ তন্তু। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ভেড়ার লোমই পশমি বস্ত্রে বেশি ব্যবহার করা হয়। পশম তন্তুর পানি শোষণক্ষমতা সবচেয়ে ভালো। পশম তন্তু বেশ নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। এজন্য সহজে ভাঁজ পড়ে না। পশম তাপের সুপরিবাহী নয়। তাই সোয়েটার, মোজা, মাফলার, কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি পশমি বস্ত্র শীতবস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পশম দিয়ে নানা ধরনের কম্বল, শাল, কার্পেট ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। ভিজলে পশমি বস্ত্রের আকৃতি ও শক্তি কিছুটা কমে যায়। তাই ধোয়া ও ইস্ত্রি করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায় এবং টেকসই হয়।

উৎস হিসেবে ভেড়ার লোম

কাজ ১– ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কয়েকটি দল তৈরি করো। প্রত্যেক দল বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের টুকরা সংগ্রহ করে তন্তুর গুণাগুণ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো এবং বিভিন্ন কাপড়ের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো।

কাজ ২– প্রাত্যহিক জীবনে কোন তন্তু কী কাজে ব্যবহৃত হয় একটি ছকে তা উল্লেখ করো।

পাঠ ২–কৃত্রিম তন্তুর গুণাগুণ

অনেক তন্তু আছে যা প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় না। মানুষ প্রাকৃতিক তন্তুর সাথে রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে কিংবা শুধু রাসায়নিক দ্রব্য থেকে যেসব তন্তু আবিষ্কার করে তাদেরকে কৃত্রিম তন্তু বলে। যেমন– নাইলন, রেয়ন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি। এই পাঠে রেয়ন ও নাইলন তন্তুর গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) রেয়নতন্তুর গুণাগুণ– রেয়ন তন্তুর বস্ত্র রেশম তন্তুর মতো সুন্দর ও উজ্জ্বল। তাই একে কৃত্রিম রেশমও বলা হয়। রেয়নের স্থিতিস্থাপকতা রেশমের চেয়ে বেশি। রেয়ন তাপের সুপরিবাহক। রেয়ন উৎপাদনের মূল উপাদান বিশুদ্ধ সেলুলোজ। রেয়ন তন্তু সাধারণত আলোর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ১৪৯° সেলসিয়াসের অধিক তাপে পুড়ে যায়। পানিতে রেয়নতন্তু সুতি অপেক্ষায় বেশি সংকুচিত হয়। মৃদু ক্ষারে এসব তন্তুর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। পরিষ্কার ও শুষ্ক অবস্থায় থাকলে এরা তিলা দিয়ে আক্রান্ত হয় না, তবে স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় থাকলে তিলা পড়ে। এসব তন্তুর রং ধারণের ক্ষমতা ভালো। পানিতে ভেজালে দুর্বল হয়ে যায়, শুকালে আবার শক্তি ফিরে আসে।

অন্যান্য বস্ত্রের তুলনায় রেয়ন সস্তা। বিভিন্ন মূল্যের রেয়ন বস্ত্র বাজারে পাওয়া যায় বলে এরূপ বস্ত্র সহজেই অনেকে কিনতে পারে। রেয়ন তন্তুর একটি গুণ হলো এর আকর্ষণীয় রূপ। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মাত্রার এরূপ উজ্জ্বল তন্তু বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া বহুমুখী ব্যবহারের জন্য এই তন্তু বেশ জনপ্রিয়। এরূপ তন্তুর নির্মিত কার্পেট, বিছানার চাদর, গৃহসজ্জার সামগ্রী, পর্দা ইত্যাদি ঘরের নতুনত্ব আনয়ন করে। রেয়ন তন্তুর বস্ত্র মজবুত, উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এরূপ বস্ত্র সহজে ধোয়া ও যত্ন নেওয়া যায়।

(খ) নাইলনতন্তুর গুণাগুণ — কৃত্রিম তন্তু বলে এর দৈর্ঘ্য ও ব্যাস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ তন্তুর কিছুটা চাকচিক্য আছে। নাইলন তন্তু ওজনে হালকা তবে বেশ মজবুত, নমনীয় এবং দীর্ঘস্থায়ী। পানিতে ভিজলে এর শক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই তন্তুর বস্ত্রে কোনো ভাঁজের দাগ পড়ে না। নাইলনের মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে না। এজন্য গরমের দিনের চেয়ে বর্ষা বা শীতের দিনে এর ব্যবহার বেশি দেখা যায়। নাইলন তন্তুর তাপ সহ্য করার ক্ষমতা কম। ১৮৯° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নাইলন তন্তু গলে যায় এবং ধূসর বা তামাটে রঙের আঠালো ছাই অবশিষ্ট হিসেবে থাকে, যা বাতাসের সংস্পর্শে শক্ত হয়ে যায়। অধিক তাপে এই তন্তু গলে যায়। তবে ধোয়ার সময় হালকা গরম পানি ব্যবহার করা চলে। সূর্যের আলোতে এ তন্তুর কোনো ক্ষতি হয় না। মৃদু ক্ষার এবং মৃদু এসিডেও কোনো ক্ষতি হয় না। তবে গাঢ় এসিডের সংস্পর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্লোরিনের মতো উগ্র ব্লিচিং পদার্থ নাইলন বস্ত্রে ব্যবহার করতে নেই।

এই তন্তু মথ, ছত্রাক প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয় না। পানি শোষণ ক্ষমতা এ তন্তুর কম। রঙের প্রতি আসক্তিও কম। রং প্রয়োগে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

নাইলনের বস্ত্র মজবুত ও ওজনে হালকা হওয়ায় এর বহুমুখী ব্যবহার দেখা যায়। টেকসই ও স্থিতিস্থাপক বলে অন্তর্বাস, মশারি, বিছানার চাদর, আসবাবপত্রের ঢাকনা, ছাতার কাপড়, ফিতা, চুলের নেট, লেস, সুতা, মাছ ধরার জাল, চামড়ার সামগ্রীর আস্তরণ, কার্পেট, গলফ খেলার ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে নাইলনের সুতা ও বস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

রেয়নতন্তু

রেয়নবস্ত্র

রেয়নসামগ্রী

নাইলনমশারি

নাইলনব্যাগ

নাইলনসামগ্রী

নাইলনের বস্ত্র সহজেই ধোয়া ও শুকানো যায়, এজন্য বর্ষার দিন বেশি ব্যবহার করা হয়। নাইলনের তন্তু অন্যান্য তন্তুর সমন্বয়ে নানা ধরনের গুণসম্পন্ন বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– নাইলন সুতি, নাইলন পশম, নাইলন রেয়ন ইত্যাদি। ময়লার প্রতি আকর্ষণ কম বলে সহজে ময়লা ধরে না। ইস্ত্রি করারও বেশি দরকার হয় না।

কাজ ১– নিচের ছকের বাম দিকের কলামে কৃত্রিম তন্তুর নাম দেওয়া আছে। প্রত্যেকের বিপরীতে ডান দিকের কলামগুলোতে উক্ত শ্রেণির তন্তুর গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখবে।

বিভিন্ন শ্রেণির তন্তু	তন্তুর গুণাগুণ	তন্তুর ব্যবহার
রেয়নতন্তু		
নাইলনতন্তু		

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিচের কোনটি তৈরিতে নাইলনতন্তু ব্যবহার করা হয়?

ক. পর্দা খ. রুমাল

গ. টেবিল কভার ঘ. ছাতার কাপড়

২. কোন তন্তুর তৈরি পোশাকে রঙের বৈচিত্র্য কম দেখা যায়?

ক. লিনেন খ. রেশম

গ. রেয়ন ঘ. নাইলন

নিচের উদ্দীপকটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফারহানা তার প্রাকৃতিক তন্তুর তৈরি সাদা রঙের দামি শাড়িটিকে ধুয়ে কড়া রোদে শুকাতে দিয়ে অফিসে চলে যান। বিকেলে বাসায় এসে শাড়িটি ঘরে আনার পর তিনি দেখতে পান কাপড়টির উজ্জ্বলতা কমে গেছে ও হলুদ রং ধারণ করছে।

৩. ফারহানার শাড়িটি কোন তন্তুর তৈরি?

ক. সুতি খ. রেশম

গ. লিনেন ঘ. রেয়ন

৪. ফারহানার শাড়িটির যথাযথ বা উপযুক্ত যত্নের জন্য প্রয়োজন–

i. ধোয়ার কাজে সাবান বা সোডা ব্যবহার না করা

ii. ছায়ায় শুকাতে দেওয়া

iii. মৃদু তাপে ইস্ত্রি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. সায়েরা গ্রীষ্মের দুপুরে ছেলে ইরফানকে সুতির শার্ট প্যান্ট ও মেয়ে সাবাকে রেশমের জামা পরিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। মা খেয়াল করেন বিয়েবাড়ির অতিরিক্ত লোকজনের ভিড়ে তার ছেলেটি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও মেয়ে সাবা কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগছে। বাসায় ফেরার পর মা ইরফান ও সাবার পরিহিত কাপড়গুলোকে একসাথে গরম পানিতে ভিজিয়ে সাবান দিয়ে ঘষে ধুয়ে দেন।

ক. ফ্ল্যাক্স-এর উৎস কোনটি?
খ. সব ঋতুতে সুতি বস্ত্রের ব্যবহার আরামদায়ক কেন? বুঝিয়ে লেখো।
গ. সাবার অস্বস্তিতে ভোগার কারণ ব্যাখ্যা করো।
ঘ. কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে সায়েরার প্রক্রিয়ার যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বস্ত্র অলংকরণ

পাঠ–১ গঠনমূলক ও সজ্জামূলক নকশা

আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের বয়ন তন্তু থেকে সুতা উৎপাদনের পর উক্ত সুতা দিয়ে বস্ত্র তৈরি করা হয়। আবার অনেক সময় সরাসরি তন্তু থেকেও বস্ত্র তৈরি করা হয়ে থাকে। বস্ত্র যে প্রক্রিয়ায়ই তৈরি করা হোক না কেন তা সব সময় সরাসরি বাজারে ছাড়া হয় না। অনেক সময় বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করে বাজারে ছাড়া হয়। বস্ত্র কতভাবে অলংকরণ করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে কি? প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র নানাভাবে অলংকরণ করা যায়। বস্ত্রের বৈচিত্র্য আনয়ন কিংবা আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্যই বস্ত্র অলংকরণ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের তন্তু থেকে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, আমরা যে পোশাক ব্যবহার করি তার মধ্যে কিছু আছে সাধারণ বস্ত্র দিয়ে তৈরি, আবার কিছু বস্ত্র আছে ডিজাইন সমৃদ্ধ। এই সাধারণ বস্ত্রের নকশাকে গঠনমূলক এবং ডিজাইন সমৃদ্ধ বস্ত্রের নকশাকে বলে সজ্জামূলক নকশা। অন্যভাবে বলা যায় যে বস্ত্রের মূল কাঠামো দেওয়ার জন্য যে নকশা করা হয় তাকে গঠনমূলক নকশা বলে এবং বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার জন্য যে নকশা করা হয়, তাকে সজ্জামূলক নকশা বলে।

ওভেন ফেব্রিকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাঁতে যে বস্ত্র উৎপাদন করা হয় তার গঠনমূলক নকশা তৈরির জন্য দুই সেট সুতার প্রয়োজন হয়। এক সেট সুতা তাঁতে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে, আর এক সেট সুতা লম্বালম্বি সুতার ভেতর দিয়ে আড়াআড়িভাবে চালনা করে বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু বস্ত্রের গঠন প্রদানের জন্য সহজ পদ্ধতিতে গঠনমূলক নকশার বস্ত্র উৎপাদন করা হয়, যেমন– এক রঙের সুতির লংক্লথ, ভয়েল, জিন্স ইত্যাদি বস্ত্র। অন্যদিকে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ডিজাইনের সুতা ব্যবহার করে জটিল প্রক্রিয়ায় সজ্জামূলক নকশার বস্ত্র উৎপাদন করা হয়, যেমন– জামদানি বস্ত্র ।

গঠনমূলক নকশার বস্ত্র

সজ্জামূলক নকশার বস্ত্র

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বস্ত্র উৎপাদনের সময়ই গঠনমূলক ও সজ্জামূলক নকশা সৃষ্টি করা হয়। তবে গঠনমূলক নকশার বস্ত্র উৎপাদনের পরও আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বস্ত্র অলংকৃত করে বস্ত্রকে সজ্জামূলক বস্ত্রে পরিণত করতে পারব। যেমন– এক রঙের কাপড়ের উপর প্রিন্টিং, পেইন্টিং, এমব্রয়ডারি বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় বস্ত্রকে সজ্জামূলক করা যায়। এক্ষেত্রে গঠনমূলক নকশার বস্ত্র উৎপাদনের সময় খেয়াল

রাখতে হবে যাতে করে পরবর্তী সময়ে তা সজ্জামূলক বস্ত্রে পরিণত করা যায়। আবার সজ্জামূলক বস্ত্রের ক্ষেত্রেও গঠনমূলক নকশার বস্ত্রের রং, জমিন ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন– সুতি বস্ত্রে উলের সুতা ব্যবহার না করাই ভালো।

গঠনমূলক নকশার বস্ত্রকে সজ্জামূলক নকশার বস্ত্রে পরিণতকরণ

কাজ– ১ গঠনমূলক এবং সজ্জামূলক নকশার বস্ত্র ক্লাসে উপস্থাপন করো।

প্রিন্টিং, পেইন্টিং, এমব্রয়ডারি বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় যখন শুধু কোনো কিছুর কাঠামো প্রদান করা হয় তখন তা গঠনমূলক নকশা হবে। অন্যদিকে সজ্জামূলক নকশায় নকশাটিকে আকর্ষণীয় ও কারুকার্যময় করা হবে। এক্ষেত্রে সজ্জামূলক নকশার বস্ত্রটি যেন অনেক জটিল না হয় এবং যুগোপযোগী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

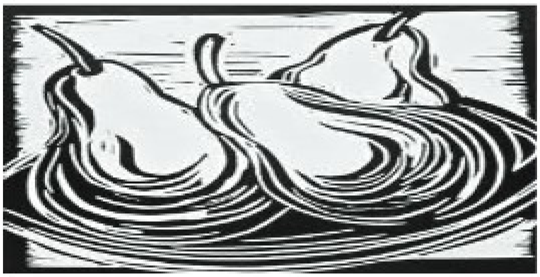

বস্ত্রের ওপর গঠনমূলক নকশা

বস্ত্রের ওপর সজ্জামূলক নকশা

কাজ ১– কী কী উপায়ে গঠনমূলক নকশা ও সজ্জামূলক নকশা সৃষ্টি করা যায়, ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করো।

পাঠ ২– ডাইং ও প্রিন্টিং

বস্ত্র উৎপাদনের সময় কীভাবে এবং কতভাবে বস্ত্র অলংকরণ করা যায় সে সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি। আমরা কি বলতে পারি কী কী পদ্ধতিতে বস্ত্র তৈরির পর অলংকরণ করা যায়? রঙের সাহায্যে ডাইং, প্রিন্টিং করে আমরা একটি সাধারণ বস্ত্রকে অসাধারণ করে তুলতে পারি। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

ডাইং– ডাইং বলতে রং প্রয়োগ করাকে বোঝায়। এই রং তন্তু, সুতা, বস্ত্র বা পোশাকে প্রয়োগ করে বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। ডাইং -এর মাধ্যমে বস্ত্রের উভয় পিঠেই রং লাগে। টাই-ডাই পদ্ধতিতে অনেক সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কাপড়কে বেঁধে, তরল রঙে কাপড় ডুবিয়েও বস্ত্রের উভয় দিকে নকশা ফুটিয়ে তোলা যায়। সরাসরি বস্ত্র রং না করে কাপড় বেঁধে রং করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে টাই-ডাই বলা হয়। এক্ষেত্রে যেসব সরঞ্জাম ও উপকরণ লাগবে তা হচ্ছে : পাতলা কাপড়, সুতা, বোতাম, ছোট ছোট পাথর, ডাল, ছোলা, রং, কস্টিক সোডা, খাওয়ার সোডা, লবণ, কাঁচি, আঠা, স্কেল, প্লাস্টিকের গামলা ইত্যাদি।

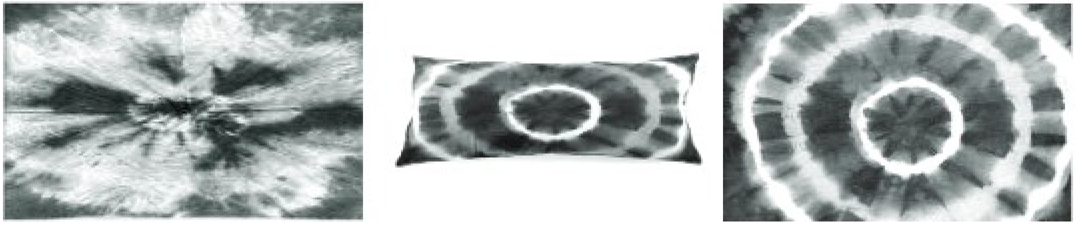

টাই-ডাই পদ্ধতিতে বস্ত্র অলংকরণ

ডাই করার পদ্ধতি– নতুন কাপড়ে মাড় থাকলে রং ভালোভাবে ধরে না। তাই প্রথমেই মাড় দূর করে, শুকিয়ে, ইস্ত্রি করে নিতে হবে। তারপর কাপড়টিকে বিভিন্নভাবে ভাঁজ দিয়ে, সেলাই করে অথবা পাথরের টুকরা, ডাল ইত্যাদি কাপড়ের ভেতর রেখে সুতা দিয়ে বেঁধে রঙে কাপড়টি ডোবাতে হবে। এতে করে বাঁধা অংশে রং ঢুকতে পারে না। ফলে শুকানোর পর যখন সুতা খোলা হবে তখন সুন্দর একটি ডিজাইন সৃষ্টি হবে। রং করার জন্য কাপড়ের ওজনের ১০ গুণ পানিতে হবে। ১ গজ কাপড় রং করার জন্য একটি স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ১ লিটার পানি ফুটন্ত গরম করে নিতে হবে। এখন তিনটি ছোট পাত্রে ১ গজ কাপড়ের জন্য $\frac{১}{২}$ গ্রাম ভ্যাট, $\frac{১}{২}$ গ্রাম কস্টিক সোডা, $\frac{১}{২}$ গ্রাম হাইড্রোসালফাইড গরম পানিতে গুলে পর্যায়ক্রমে ফুটন্ত পানিতে ছেঁকে দিতে হবে। এরপর রঙের পাত্রে কাপড় দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। ১৫ মিনিট পর ঠান্ডা পানি দিয়ে কাপড় ধুয়ে, শুকিয়ে, বাঁধন খুলে ইস্ত্রি করে নিতে হবে।

> **কাজ ১–** প্রত্যেকে ১২″/১২″ এক টুকরা কাপড়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাঁধো এবং বাঁধা কাপড়টি রং করে, ধুয়ে, শুকিয়ে ডিজাইনটি তুলে ধরো আর পরবর্তী ক্লাসে দেখাও।

প্রিন্টিং– প্রিন্টিং মানেই হচ্ছে বস্ত্রে রং ও নকশার একত্রে প্রয়োগ। প্রিন্টিং বা ছাপার মাধ্যমে রঙয়ের সাহায্যে নকশা সৃষ্টি করে বস্ত্র বা পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। আমরা ঘরে বসেই এ কাজ করতে পারব।

প্রিন্টিং–এর কাজ তন্তু বা সুতায় করা যায় না। বস্ত্র বা পোশাকের নির্ধারিত নকশায় বিভিন্ন রঙের ছাপ দেওয়া হয়। ছাপার কাজে বস্ত্রের এক পিঠে রং করা হয়।

নানা ধরনের প্রিন্টিং-এর মাধ্যমে আমরা বস্ত্র অলংকরণ করতে পারি। যেমন– ব্লক প্রিন্টিং, বাটিক প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং ইত্যাদি। এর মধ্যে ব্লক প্রিন্টিং এর কাজটিই সবচেয়ে সহজ।

উপকরণ ও সরঞ্জাম– ব্লক প্রিন্টিং-এর জন্য আমাদের যেসব উপকরণ ও সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে সেগুলো হচ্ছে কাঠের টেবিল, রঙের ট্রে, রং, বিভিন্ন ধরনের ব্লক, পুরোনো কম্বল, তুলি, মার্কিন কাপড় ইত্যাদি।

ব্লক তৈরি– কাঠ, রাবার, স্পঞ্জ, সাবান, লিনোলিয়াম ইত্যাদি দিয়ে আমরা ব্লক তৈরি করতে পারব। বাজারে ব্লক কিনতে পাওয়া যায় এবং কেনা ব্লক অনেকদিন সংরক্ষণও করা যায়। তবে ঘরে আলুর উপর সুন্দর ডিজাইন করেও আমরা ব্লক তৈরি করতে পারি। এছাড়া ঢেঁড়শ, শাপলা ইত্যাদিরও নিজস্ব ডিজাইন রয়েছে। তাই এদের ওপর ডিজাইন আকার প্রয়োজন হয় না, কেটে নিলেই ডিজাইন দেখতে পাওয়া যায়।

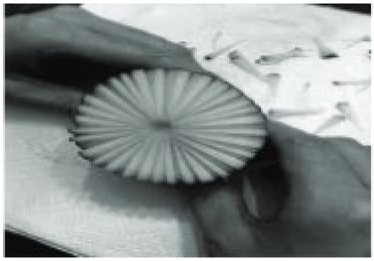

আলুর ব্লক

ট্যাঁড়শের সাহায্যে প্রিন্টিং

কাঠের ব্লকের সাহায্যে প্রিন্টিং

ছাপা পদ্ধতি– প্রিন্টিং-এর আগে কাপড় ভালোভাবে ধুয়ে, ইস্ত্রি করে এবং কোন কোন অংশে ছাপ দেওয়া হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। তারপর কাঠের টেবিলের উপর পুরোনো চাদর ও খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর কাপড়টি বিছিয়ে নিতে হবে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুত রং কিনতে পাওয়া যায়। ব্লকে ভালোভাবে ঐ রং লাগিয়ে কাপড়ের উপর চাপ দিলেই প্রিন্টিং হয়ে যায়। ছাপা হয়ে গেলে ছায়াযুক্ত স্থানে বা বাতাসে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

কাজ ১– প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান বা রাবার-এর উপর ব্লক তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে একটি কাপড় প্রিন্ট করো।

পাঠ ৩– পেইন্টিং, এমব্রয়ডারি (ক্রস ফোঁড়)

রঙের সাহায্যে পেইন্টিং করে কিংবা সুচ সুতার সাহায্যে এমব্রয়ডারি করেও আমরা একটি সাধারণ বস্ত্রকে অসাধারণ করে তুলতে পারি। এক্ষেত্রে কোন কাজের জন্য কী ধরনের সরঞ্জাম লাগবে এবং কীভাবে বস্ত্র অলংকৃত করা যাবে সে সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পেইন্টিং– এ পদ্ধতিতে আমাদের যেসব জিনিস প্রয়োজন হবে, সেগুলো হচ্ছে–বিভিন্ন সাইজের তুলি, রং, মিডিয়াম, টেবিল, মোটা কম্বল, কাপড়, ইস্ত্রি ইত্যাদি। পেইন্টিং পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ডিজাইনের মাধ্যমে বস্ত্র অলংকরণ করতে পারা যায়।

পেইন্টিং-এর সাহায্যে বস্ত্র অলংকরণ

পদ্ধতি– প্রথমে কাপড় ধুয়ে মাড় দূর করে ইস্ত্রি করে নিতে হবে। তারপর কাপড়ে ডিজাইন এঁকে টেবিলের ওপর কম্বল বিছিয়ে, তার ওপর কাপড়টি রেখে তুলি দিয়ে নির্ধারিত জায়গায় রং প্রয়োগ করতে হবে। রং বেশি ঘন হলে কয়েক ফোঁটা মিডিয়াম দিয়ে পাতলা করে নিতে হবে। তবে বেশি পাতলা যেন না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। রং করা হয়ে গেলে ছায়ায় শুকিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হবে। ইস্ত্রি করার সময় রং করা অংশের উপর একটি আলগা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নিতে হবে। পেইন্টিং -এর মাধ্যমে বিভিন্ন পোশাক, দেয়াল সজ্জা বা গৃহসজ্জার সামগ্রী আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

কাজ ১– নকশা এঁকে একটি কাপড়ে পেইন্টিং করো।

এমব্রয়ডারি – বস্ত্র অলংকরণে এমব্রয়ডারি বিশেষ অবদান রাখে। আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে এমব্রয়ডারি কী? সুচ সুতার সাহায্যে বিভিন্ন রকম ফোঁড় ব্যবহার করে বস্ত্রের ওপর যে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় তাকেই বলা হয় সুচি নকশা বা এমব্রয়ডারি। বস্ত্রে এমব্রয়ডারির প্রচলন অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। তবে আগে এমব্রয়ডারির কাঁচামাল ছিল খাঁটি রেশম সুতা, সোনা বা রুপার তৈরি সুতা, দামি মুক্তা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। বর্তমানকালে আমরা কাঁচামাল হিসেবে বেশ সাধারণ উপকরণ দিয়েই একাজ করতে পারি। যেমন বিভিন্ন রঙের সুতা, চুমকি, আয়না, পুঁতি ইত্যাদি। এছাড়া এ কাজের জন্য প্রয়োজন হবে বিভিন্ন ধরনের সুচ, ফ্রেম, কাগজ, কার্বন পেপার, পেন্সিল, স্কেল, রাবার, কাঁচি, কাপড় ইত্যাদি।

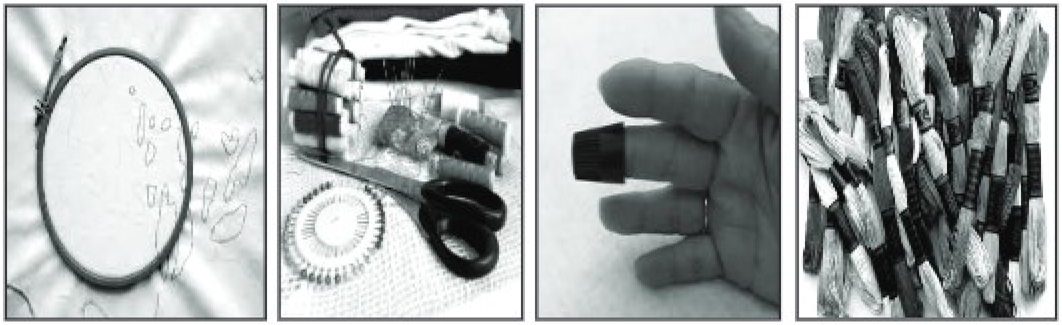

হ্যান্ড এমব্রয়ডারির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

পদ্ধতি– এ কাজে কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কাজ করার সময় পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমে কাপড়ের পর হালকা করে ডিজাইন একে নিতে হবে। এরপর ফ্রেমে কাপড় আটকিয়ে সুচ সুতার সাহায্যে বিভিন্ন রকম ফোঁড় ব্যবহার করে কাজ শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে ফোঁড়গুলো অতিরিক্ত ঢিলা বা টাইট হওয়া যাবে না। সবশেষে উল্টো দিকে ইস্ত্রি করে নিলে সেলাই সুন্দর ও মসৃণভাবে কাপড়ের উপর বসে যায়।

হ্যান্ড এমব্রয়ডারি

এমব্রয়ডারি করার জন্য বিভিন্ন ফোঁড় সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকতে হবে এবং প্রকৃত কাজ করার আগে চর্চার মাধ্যমে এ কাজে দক্ষতা আনতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, নকশার বিভিন্ন অংশে যেন সঠিক ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। রং নির্বাচনেও সতর্ক থাকতে হবে। যেমন– ফুলের জন্য লাল, গোলাপি, হলুদ ইত্যাদি আবার পাতার জন্য সবুজ রং বাছাই করা যেতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বিভিন্ন স্টিচ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। এ পাঠে আরও কিছু ফোঁড় উল্লেখ করা হলো–

ক্রস ফোঁড়– চটজাতীয় কাপড়ের উপর এই ফোঁড় প্রয়োগ করে সুন্দর ডিজাইন সৃষ্টি করা যায়। এই সেলাইয়ের জন্য চিত্রের মতো এক সারি ফোঁড় তেরছা অথচ সমান্তরালভাবে করে যেতে হবে। তারপর আগের ফোঁড়কে ভিত্তি করে চিত্রের মতো ক্রসভাবে ফোঁড় তুলতে হবে।

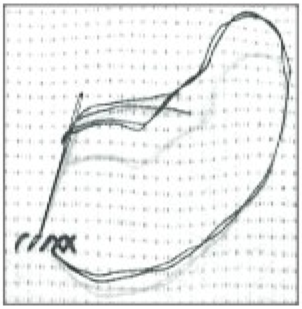
ক্রস ফোঁড়

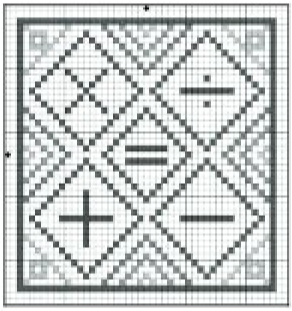
ক্রস ফোঁড়ের ডিজাইন

পাঠ ৪– ব্লাংকেট, হেরিং বোন, পালক, স্যাটিন, পিকনিজ ও ফ্রেঞ্চ নট

ব্লাংকেট ফোঁড়– ব্লাংকেট ফোঁড় তৈরি করার সময় সেলাই বাম দিক থেকে ডান দিকে সরে যায়। নকশা বরাবর ওপর হতে সুচ ফুটিয়ে মাথা নিচের দিকে বের করে সুতা সুচের ওপর রেখে সুচ টেনে বের করতে হয়। কম্বলের খোলা ধার, রুমালের কিনারা, বোতাম ঘর, হাতার কিনারা ইত্যাদিতে এই ফোঁড় প্রয়োগ করা হয়।

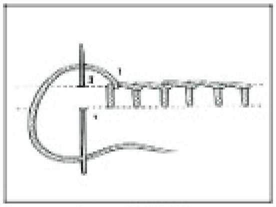
ব্লাংকেট ফোঁড়

কাজ ১– ক্রস ফোঁড়ের সাহায্যে একটি ডিজাইন তৈরি করে কিনারায় ব্লাংকেট ফোঁড় ব্যবহার করো।

হেরিং বোন ফোঁড়

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাব যে এই সেলাই দেখতে অনেকটা হেরিং মাছের কাটার মতো। তাই একে হেরিং বোন সেলাই বলে। এটা অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মতো। চিত্র অনুসরণ করে সেলাই করলেই ডিজাইন ফুটে উঠবে।

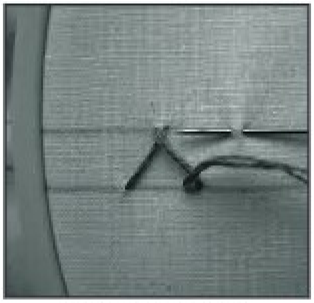
হেরিং-বোন ফোঁড়

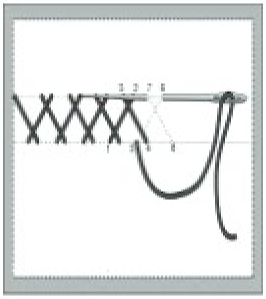
হেরিং-বোন ফোঁড়

পালক ফোঁড়– পাখির পালকের মতো দেখতে হওয়ায় এ ফোঁড়কে পালক ফোঁড় বলা হয়। ডানদিকে বাঁকাভাবে ব্লাংকেট ফোঁড় দিয়ে পালক ফোঁড় সেলাই করা যায়। এছাড়া একই দিকে ৩/৪টি বোতামঘর ফোঁড় দিয়েও পালক ফোঁড় সেলাই করা যায়। ছোটদের জামার কলার, হাতার কিনারা, ট্রে ক্লথ, চাদরের কিনারা প্রভৃতি স্থানে এই ফোঁড় দেওয়া হয়।

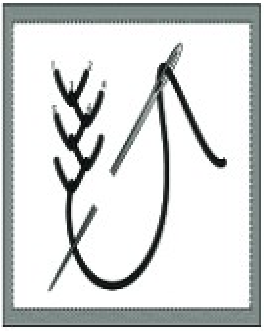
পালক ফোঁড়

পালক ফোঁড়

কাজ ১– নেপকিনের কিনারায় হেরিং বোন ও পালক ফোঁড় প্রয়োগ করো।

স্যাটিন ফোঁড় – ফুল, লতা পাতা ইত্যাদির ভেতরের অংশ ভরাট করতে এ সেলাই প্রয়োজন। সাধারণত নকশা ভরাট করার কাজে এ সেলাই ব্যবহার করা হয়। এ সেলাই সোজা ও উল্টো-দিকে একই রকম হয়। অনেক সময় প্রথমে নকশার বাইরের স্থানটিতে রান ফোঁড় দিয়ে নিয়ে মাঝের অংশে ঘনঘন লম্বা ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা হয়।

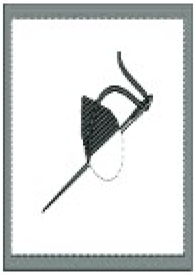
স্যাটিন ফোঁড়

স্যাটিন ফোঁড়

কাজ ১– তোমার পছন্দমতো একটি নকশা এঁকে স্যাটিন ফোড়ের সাহায্যে ভরাট করো।

পিকিনিজ ফোঁড়– এই সেলাইয়ের জন্য প্রথমে এক লাইনে সমান মাপের বখেয়া ফোঁড় দিয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় সেলাই শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে সুচটি প্রথমে চিত্রের মতো নিচ থেকে ওপরে তুলতে হবে। তারপর দ্বিতীয় ফোঁড়ের নিচ দিয়ে সুচটি ওপরে তুলে প্রথম ফোঁড়ের নিচ দিয়ে আনতে হবে। আবার তৃতীয় ফোঁড়ের

নিচ দিয়ে সুচটি ওপরে তুলে দ্বিতীয় ফোঁড়ের নিচ দিয়ে আনতে হবে। বখেয়া সেলাইকে ঘিরে এই ফাঁসগুলো ক্রমান্বয়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে করে গেলে সুন্দর একটি ডিজাইন ফুটে ওঠে।

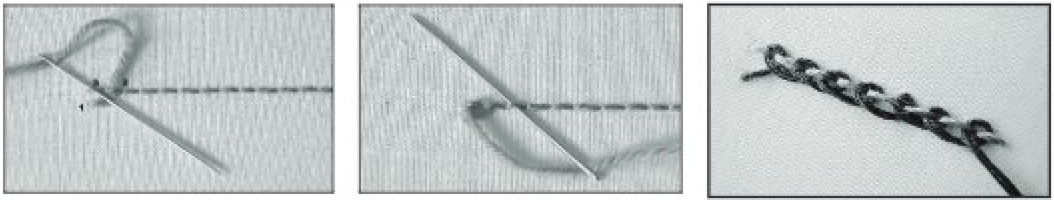

পিকিনিজ ফোঁড়

কাজ ১– একটি কাপড়ে বখেয়া ফোঁড় প্রয়োগ করে ভিন্ন রঙের সুতার সাহায্যে পিকিনিজ ফোঁড়ের চর্চা করো।

ফ্রেঞ্চ নট– ফ্রেঞ্চ নটের জন্য প্রথমে কাপড়ের সোজা দিকে সুচের কিছু অংশ তুলে অগ্রভাগে সুতার কয়েকটি পাক দিতে হবে। তারপর বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে প্যাঁচানো অংশ চাপ দিয়ে ধরে সুচ ওপরে টেনে বের করে প্রথমে যেখানে সুচটি ওঠানো হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় আবার বসিয়ে দিতে হবে। এভাবে দুই-তিনবার করলেই ছোট ফুলের মতো দেখাবে।

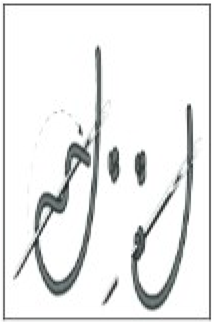

ফ্রেঞ্চ নট

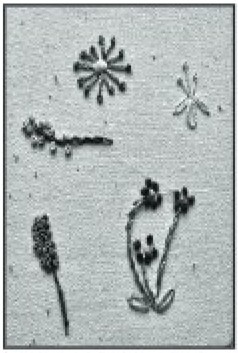

ফ্রেঞ্চ নটের ডিজাইন

কাজ ১– একটি কাপড়ে ডিজাইন এঁকে ফ্রেঞ্চ নটের সাহায্যে ফুল তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. এমব্রয়ডারির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান–

ক. সুতা, চুমকি, পুঁতি
খ. রং, তুলি, মিডিয়াম
গ. কস্টিক সোডা, লবণ, আঠা
ঘ. তুলি, রঙের ট্রে, ব্লক

২. সাধারণত চটজাতীয় কাপড়ের ওপর কোন ফোঁড় দিয়ে সহজে নকশা তৈরি করা যায়?

ক. পিকিনিজ ফোঁড়
খ. স্যার্টিন ফোঁড়
গ. ব্লাংকেট ফোঁড়
ঘ. ক্রস ফোঁড়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নীলা তাঁর মেয়ে রোদেলার জন্য বাজার থেকে একটি সাদামাটা জামা কিনে এনে জামাটিতে কিছু চুমকি আয়না ও পুঁতি লাগিয়ে দিলেন।

৩. রোদেলার জামাটি কোন পদ্ধতিতে অলংকৃত করা হয়েছে?

ক. প্রিন্টিং খ. পেইন্টিং
গ. ডাইং ঘ. এমব্রয়ডারি

৪. অলংকরণের ফলে রোদেলার জামাটি হবে–

i. আকর্ষণীয়
ii. কারুকার্যময়
iii. বৈচিত্র্যময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

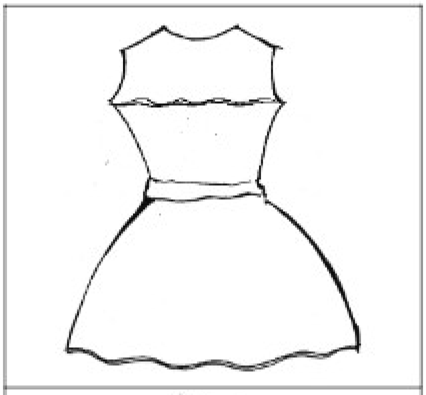
চিত্র– ১

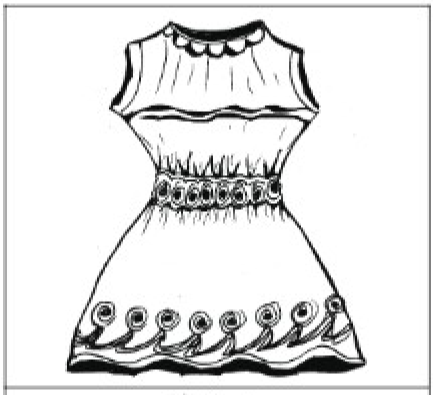
চিত্র– ২

ক. এমব্রয়ডারি কী?
খ. একটি সাধারণ বস্ত্রকে কীভাবে অসাধারণ করা যায়? বর্ণনা করো।
গ. ১ নং চিত্রের বস্ত্রটি কোন কোন পদ্ধতিতে অলংকৃত করা যায়– ব্যাখ্যা করো।
ঘ. কাপড়ের বৈচিত্র্য আনয়নে ২ নং চিত্রের ভূমিকাই বেশি– তুমি কি একমত? সপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

পোশাকের পারিপাট্য ও ব্যক্তিত্ব

পাঠ ১– ব্যক্তিত্ব

আমরা একটু লক্ষ করলে দেখতে পারব যে আমাদের ক্লাসের প্রত্যেকেরই বিশেষ কিছু গুণ রয়েছে। যার ফলে আমরা একজন অন্যজন থেকে আলাদা। ব্যক্তিবিশেষের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। আমাদের শারীরিক গঠন, চালচলন, কণ্ঠস্বর, মেজাজ ও আবেগের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। উত্তম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে একজন মানুষ অন্য মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে, আবার দুর্বল ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারব যে, উত্তম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে তার দেহের সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি আগ্রহ। পৃথিবীর প্রত্যেকের মতো আমরাও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। তবে বড় হওয়ার সাথে সাথে আমরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সুস্থ ও আর্কষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারব। উত্তম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন নিয়ে জীবনের যেকোনো অবস্থা মোকাবেলা করতে পারে। রুগ্ন স্বাস্থ্য ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তার প্রতিটি কাজে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠন করা যায়।

অসুস্হ শরীর

সুস্হ শরীর

ব্যক্তিত্বের সামাজিক মূল্য অনেক বেশি। আমরা জীবনের মান, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে অর্জন করতে পারি। কাজেই সফলতার পাশাপাশি সবার গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়ে, নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে, পরিবেশ উপযোগী পারিপাট্য বজায় রেখে, বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে সুস্থ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি।

আমরা কি বলতে পারব পারিপাট্য বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যক্তিত্বের সাথে এর সম্পর্কই-বা কী? স্কুলে আসার আগে আমরা নিশ্চয়ই পরিপাটি হয়ে এসেছি। পারিপাট্য বলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকেই বোঝানো হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেহ, সময় উপযোগী রুচিশীল পোশাক এবং মার্জিত চলাফেরার মাধ্যমেই উত্তম ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায়। আর এরূপ ব্যক্তির চলাফেরা ও পরিপাটি বেশভূষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সহজ করতে সাহায্য করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অপরিষ্কার দেহ কিংবা অপরিচ্ছন্ন মূল্যবান পোশাকে পারিপাট্য আনা যায় না। সুবেশী হতে হলে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া দরকার। অন্যদিকে এলোমেলো চুল, অপরিষ্কার দাঁত, নখ, হাত-পা ইত্যাদি যেকোনো অবস্থাতেই বিরক্তির সৃষ্টি করে। তাই নিয়মিত গোসল করে হাত, পা, চুল, নখ ইত্যাদির যত্ন নেওয়া উচিত।

পারিপাট্য রক্ষায় নখ, হাত, চুল, পা ইত্যাদির যত্ন

পারিপাট্য রক্ষায় উপযুক্ত পোশাকের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা উপযুক্ত পরিবেশে দেশীয় কৃষ্টির সাথে মিল রেখে এবং ঋতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করব। যেমন– আমাদের দেশের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য এমন পোশাক নির্বাচন করব যা সহজে ঘাম শোষণ করে নেয়, ধোয়া যায় ও ইস্ত্রি করা যায়। এছাড়া দেহের আকৃতির সাথে মিল রেখে চুল বাঁধব। প্রসাধনসামগ্রী কখনো খুব বেশি ব্যবহার করব না। এতে ত্বকেরও ক্ষতি হয়। সব সময় ত্বকের রং, দেহের আকৃতি, উচ্চতা, ব্যক্তিত্ব, রুচি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে পোশাক পরিধান করব, এতে করে মনে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে, মন প্রফুল্ল থাকবে এবং কাজে উৎসাহ আসবে।

কাজ ১– ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কীভাবে পারিপাট্য রক্ষা করা যায়? দলীয়ভাবে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২– ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের সম্পর্ক

ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা আচরণই হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের একটি সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুন্দর পোশাক রুচিশীল মনের পরিচয় দেয় এবং ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। কাজেই দেখা যায় যে, পোশাক ও ব্যক্তিত্ব এ দুটি একে অন্যের পরিপূরক। তবে এক্ষেত্রে জানতে হবে যে কোন পোশাক কার জন্য কতটুকু উপযুক্ত? আর এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে সবার আগে আমাদের নিজেকে জানতে হবে। অর্থাৎ আমার নিজের গায়ের রং, উচ্চতা, ওজন, দেহের গঠন, বয়স, মুখের আকৃতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ রেখে পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করতে হবে। এছাড়া যেসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, সেগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

১. পোশাকের ছাপা– বড় ও ছোট ছাপা ব্যক্তিত্বের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। বড় বড় ছাপার নকশাবহুল পোশাকে স্থূলকায় ব্যক্তিকে আরও স্থূলকায় দেখায়। তাই খর্বাকৃতি ও স্থূলকায়দের জন্য ছোট ছোট ছাপার পোশাক উপযোগী।

বড় ছাপার নকশাবহুল পোশাক

ছোট ছাপার নকশাবহুল পোশাক

২. পোশাকের রং– পোশাকের জন্য উপযুক্ত রং নির্বাচন করেও আমরা দেহের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারব। পোশাকের রং দেহের সাথে মানানসই না হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। দেহের ত্বক, চুল ও চোখের রঙের সাথে মিল রেখে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত। যাদের দেহের রঙ উজ্জ্বল তারা যেকোনো রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে, তবে শ্যামলা রঙের ব্যক্তিদের হালকা রঙের পোশাকে ভালো দেখায়। লাল, হলুদ, কমলা রংগুলো গাঢ় ও উজ্জ্বল হওয়ায় দূর থেকে এদের চোখে পড়ে। যেহেতু এই উষ্ণ রংগুলোর তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি, তাই গরমকালে এ ধরনের রঙের পোশাকে আরও গরম অনুভূত হয়। এই রঙের পোশাকে পাতলা গড়নের ব্যক্তিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী বলে মনে হয়।

উষ্ণ রঙের পোশাক

হালকা রঙের পোশাক

অন্যদিকে নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি রং হালকা ও স্নিগ্ধ হওয়ায় এদের ঠান্ডা মনে হয়। তাই গরম কালে এ রঙের পোশাক নির্বাচন করা যেতে পারে।

৩. লম্বা এবং আড়াআড়ি রেখার পোশাক– চেক ও স্ট্রাইপ কাপড় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাক ব্যক্তির দেহ কাঠামোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বড় করে তোলে। অন্যদিকে আড়াআড়ি রেখার পোশাকে অতিরিক্ত লম্বা ব্যক্তির দেহ কাঠামোকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছোট দেখায়।

পোশাকে আড়াআড়ি ও খাড়া রেখার প্রভাব

৪. পোশাকের আকার – পোশাকের আকারের তারতম্য করেও দেহাকৃতির ওপর প্রভাব ফেলা যায়। পাতলা গড়নের ব্যক্তির জন্য ঢিলেঢালা, ফুল হাতা, ছোট গলার পোশাক বিশেষ উপযোগী। আবার বড় গলা, ছোট হাতার আঁটোসাঁটো পোশাকে স্থূলকায় ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হবে।

৫. পোশাকের পরিচ্ছন্নতা– ব্যক্তিত্ব বিকাশে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদের সাথে সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমরা আগেই জেনেছি যে নোংরা হলে দামি পোশাকও বিরক্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থা মানুষের ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে না।

৬. সমাজের রীতিনীতি– ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করার জন্য সমাজের রীতিনীতির দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন ধরনের পোশাক পরিধান না করাই ভালো। এতে ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য ফুটে উঠে না।

সর্বোপরি পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, অলংকার ইত্যাদি সামগ্রী উপলক্ষ্য,নিজের সামর্থ্য ও অনুষ্ঠানের ভাবধারার প্রতি লক্ষ রেখে পরিধান করলে আত্মতৃপ্তির পাশাপাশি ব্যক্তিত্বও সবার কাছে প্রশংসিত হয়।

কাজ ১– ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের ডিজাইনের সম্পর্ক লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. পাতলা ব্যক্তির জন্য কোন ধরনের হাতার পোশাক বিশেষ উপযোগী?

ক. ছোট হাতা খ. ফুল হাতা

গ. থ্রী কোয়ার্টার ঘ. হাতকাটা

২. উপলক্ষ্যের প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক নির্বাচন করলে

i. অপরের প্রশংসা পাওয়া যায়
ii. ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়
iii. আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জবা ও রেবা দুই বোন। জবা আকারে লম্বা। অন্যদিকে রেবা শ্যামলা ও আকারে ছোট। তাই রেবা পোশাক নির্বাচনে সচেতন।

৩. কোন রেখার পোশাক জবাকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট দেখাবে?

i.
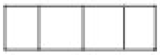

ii.
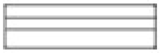

iii.
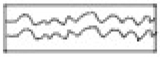

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. রেবার পোশাকের জন্য নিচের কোনটি অধিকতর উপযোগী

ক. গাঢ় রঙের বড় ছাপা
খ. হালকা রঙের বড় ছাপা
গ. হালকা রঙের ছোট ছাপা
ঘ. গাঢ় রঙের ছোট ছাপা

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. কমল ও কারিনা দুই ভাই বোন। গায়ের রং ও দেহের কাঠামোতে একে অপরের বিপরীত। কারিনা কৃষ্ণকায় এবং কমল স্থূলকায়। পোশাকের ক্ষেত্রে কমল হালকা রং ও ছোট ছোট ছাপাকে প্রাধান্য দেয়। কারিনা ঢিলেঢালা কিন্তু উজ্জ্বল গাঢ় রঙের পোশাক পছন্দ করে। দাম নয়, পোশাকের নকশা ও আরামের বিষয়টি কমল ও কারিনা সব সময় বিবেচনা করে থাকে।

ক. ব্যক্তিত্ব কী?
খ. "পোশাক ও ব্যক্তিত্ব এ দুটি একে অন্যের পরিপূরক"– ব্যাখ্যা করো।
গ. পোশাক নির্বাচনে কারিনার উজ্জ্বল গাঢ় রঙের পোশাক নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের সম্পর্ক বিবেচনায় কমল ও কারিনার পোশাক নির্বাচন কতটা যথার্থ হয়েছে আলোচনা করো।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা

পাঠ ১ – দাগ তোলা

সুষ্ঠুভাবে পোশাক পরিচ্ছন্নতার কাজটি সম্পন্ন করতে হলে কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। যেমন– বস্ত্র বাছাই করা, মেরামত করা, দাগ দূর করা, ধোয়ার উপকরণ ঠিক করা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখা, ধোয়ার পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। উপরোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করলে কাজটি যেমন– সহজ হয়ে উঠবে তেমনি সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যাবে।

পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে দাগ অপসারণ বস্ত্র ধোয়ার পূর্ব প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। কখনো কখনো পোশাক-পরিচ্ছদে এমন কিছু চিহ্ন বা রং দেখা যায় যেগুলো সাধারণভাবে ধুলে পরিষ্কার হয় না। এ ধরনের চিহ্ন অপসারণ করতে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের এ ধরনের অবাঞ্চিত চিহ্নকেই দাগ হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্ত্র ধোয়ার আগে উক্ত দাগ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী অপসারণ করা প্রয়োজন। নতুবা উক্ত দাগ স্থায়ী হবার এবং অন্য বস্ত্রে লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে দাগ অপসারণের জন্য যেসব অপসারক ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১) মৃদু অপসারক– অক্সালিক এসিডের লঘু দ্রবণ, সিরকা বা এসেটিক এসিড, বেকিং সোডা, এমোনিয়া, বোরাক্স, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ইত্যাদি মৃদু অপসারক। মৃদু অপসারক ব্যবহারে সাধারণত কাপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না। এজন্য দামি মিহি কাপড়ের দাগ অপসারণের জন্য এসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

২) উগ্র অপসারক– কাপড় কাঁচার সোডা, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, গাঢ় অক্সালিক এসিড, জাভেলী ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাদি উগ্র অপসারক। এসব অপসারক বেশি সময় ধরে কাপড়ের সংস্পর্শে থাকলে কোনো কোনো কাপড়ের ক্ষতি হয়। এজন্য সর্তকতার সাথে এসব ব্যবহার করা উচিত।

কাপড় থেকে দাগ দূর করার সাধারণ নিয়ম

বস্ত্রাদি থেকে দাগ দূর করার সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সেগুলো হলো–

১। কাপড়ে কোনো দাগ লাগলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাগ অপসারণের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ পুরোনো দাগ পরিষ্কার করা তুলনামূলকভাবে কঠিন।

২। কাপড়টি কোন শ্রেণির তন্তু দিয়ে তৈরি তা জানতে হবে, কারণ বিভিন্ন ধরনের তন্তুর জন্য বিভিন্ন অপসারক ব্যবহার করা হয়।

৩। দাগের উৎস জানতে হবে। উৎস না জেনে ভুল অপসারক ব্যবহার করলে অনেক সময় দাগ না ওঠে স্থায়ীভাবে বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪। অজানা দাগে কখনো গরম পানি সরাসরি ব্যবহার করতে হয় না। এতে অনেক দাগ স্থায়ীভাবে বসে যায়।

৫। রঙিন কাপড়ে অপসারক ব্যবহারের আগে কাপড়ের রং নষ্ট করবে কি না তা জানা প্রয়োজন। এজন্য কাপড়ের এক কোনায় অল্প একটু অপসারক দ্রব্য ব্যবহার করে এ পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৬। প্রথমে মৃদু অপসারক ব্যবহার করতে হবে। দাগ না উঠলে উগ্র অপসারক ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭। দাগ উঠে গেলে কাপড় থেকে অপসারক দ্রব্যটি ধুয়ে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে।

৮। অপসারক দ্রব্যটি এসিড হলে দাগ উঠানোর পর কোনো লঘু ক্ষার দিয়ে প্রশমিত করতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো ক্ষারযুক্ত অপসারক দ্রব্য লঘু এসিড দিয়ে প্রশমিত করতে হবে।

৯। একবারে কোনো শক্তিশালী অপসারক ব্যবহার না করে দুই থেকে তিনবার মৃদু অপসারক ব্যবহার করা নিরাপদ।

১০। কাপড় অপসারক দ্রবণে বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখা ঠিক না। দাগ দূর হওয়া মাত্র ধুয়ে শুকাতে দিতে হবে।

পোশাকটি যদি ধোয়ার যোগ্য হয় তাহলে দাগ অপসারণের ব্যাপারটি বেশ সহজ ও আনন্দদায়ক। এখানে কাপড় থেকে বিভিন্ন ধরনের দাগ অপসারণের উপায়গুলো বর্ণনা করা হলো–

১। রক্তের দাগ – সুতি ও লিনেন বস্ত্রে রক্তের দাগ লাগলে দাগযুক্ত স্থানটি কিছুক্ষণ ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর মৃদু সাবান গোলা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়। দাগ পুরোনো হলে লঘু এমোনিয়ার দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে তারপর পানি দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হয়। রেশমি ও পশমি বস্ত্রে যদি দাগ না উঠে তবে লবণ গোলা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয়।

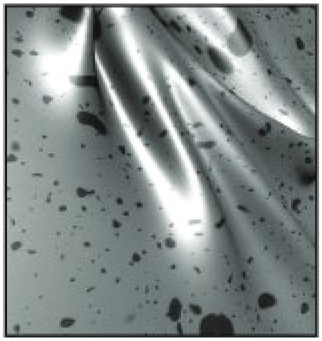
রক্তের দাগ

২। কাদার দাগ– সাবান পানিতেই দাগ উঠে যাবার কথা। যদি না উঠে সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ অথবা অক্সালিক এসিডের দ্রবণে ভিজিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

কাদার দাগ

কাজ ১– রক্ত ও কাদার দাগ অপসারণের উপায় লেখ।

পাঠ ২ – অন্যান্য দাগ তোলা

কালির দাগ

কালির দাগ–সুতি ও লিনেন বস্ত্রে বলপেনের কালি লাগলে, দাগ বরাবর কাপড়ের নিচে ব্লটিং পেপার রেখে দাগযুক্ত স্থানটিতে প্রথমে মেথিলেটেড স্পিরিট ও তুলার গোল বল দিয়ে স্পঞ্জ করে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। জুতার কালিও একইভাবে অপসারণ করতে হবে। লেখার কালির দাগ লাগলে প্রথমে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এতে কালির দাগ দূর না হলে লঘু অক্সালিক এসিড বা এমোনিয়া দিয়ে পুনরায় ধুতে হবে।

ফুল ও ফলের কষের দাগ

ফুল ও ফলের কষ–সাদা সুতি বা লিনেন বস্ত্রে ফলের কষ লাগলে ফুটন্ত গরম পানি ধীরে ধীরে ঐ দাগ বরাবর একটু উপর থেকে ঢালতে হয়। তারপর সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তবে জামের কষে সাবান ব্যবহার নিষিদ্ধ। রঙিন সুতি, লিনেন, রেশমি, পশমি এবং সিনথেটিক বস্ত্রে ফলের কষ লাগলে প্রথমে হালকা গরম পানি তারপর গ্লিসারিন ও সাদা ভিনেগার দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।

চা ও কফির দাগ

চা ও কফির দাগ– সুতি ও লিনেন বস্ত্রে চা ও কফির দাগ লাগলে দাগযুক্ত স্থানটিতে বোরাক্স দ্রবণ বা লেবুর রস মেখে রোদে শুকানো হয়। এছাড়া ফুটন্ত পানি ১ থেকে ৩ ফুট ওপর থেকে ধীরে ধীরে ঢাললেও এই দাগ দূর হয়। রেশমি ও পশমি বস্ত্রে দাগ লাগলে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্রবণে ভিজিয়ে স্পঞ্জ করে পরিষ্কার করা যায়।

হলুদের দাগ

হলুদের দাগ– সাদা সুতি ও লিনেন বস্ত্র হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে সাবান মেখে ঘাসের ওপর রেখে দিয়ে সূর্যালোকে শুকালে হলুদের দাগ উঠে যায়। অন্যান্য কাপড়ের ক্ষেত্রে দাগযুক্ত স্থানে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে অল্পক্ষণ রাখতে হয়, তারপর ভালোভাবে ধুয়ে শুকাতে হয়।

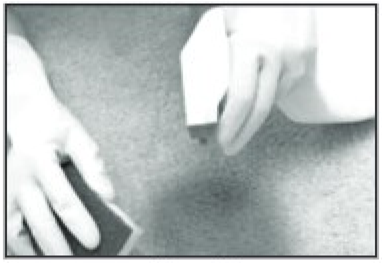

লোহার দাগ

লোহার দাগ– লোহার দাগ নতুন হলে কাগজি লেবুর রস ঘসে পরিষ্কার করতে হয়। পুরোনো দাগে লবণ ও কাগজি লেবুর রস দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। লঘু অক্সালিক এসিড দিয়েও লোহার দাগ দূর করা যায়।

ঘামের দাগ

ঘামের দাগ– নতুন ঘামের দাগ হলে সুতি ও লিনেন বস্ত্র সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকালেই হয়, দাগ পুরোনো হলে এমোনিয়া দ্রবণ বা লঘু হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্রবণে ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার করতে হয়। রঙিন সুতি ও লিনেন বস্ত্র হলে দাগযুক্ত স্থানটি লঘু এমোনিয়ার দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর মৃদু হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এবং সোডিয়াম হাইপোসালফাইটের দ্রবণে ভিজিয়ে রাখলে সব ধরনের ঘামের দাগ দূর হয়।

তরকারির ঝোলের দাগ

তরকারির ঝোলের দাগ– সাদা ও রং পাকা সুতির কাপড়গুলো সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে দিতে হয়। এতে যদি দাগ অপসারণ না হয় তবে জাভেলী ওয়াটার দিয়ে ব্লিচ করা দরকার। রেশমি, পশমি ও রঙিন সুতির কাপড় সাবান গোলা পানি দিয়ে ধুয়ে ১০% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

কাজ– হলুদের দাগ, লোহার দাগ, ঘামের দাগ, তরকারির ঝোলের দাগযুক্ত কাপড়ের দাগ অপসারণের উপায় দলীয়ভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৩ – ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি ও রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

প্রায় সব পরিবারেই বস্ত্র ধোয়ার কাজটি কম বেশি সম্পাদন করতে হয়। বস্ত্র ধোয়ার কাজটি সহজ হলেও এজন্য তন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা ভালো। বস্ত্র ধোয়ার আগে কিছু নিয়ম অনুসরণ করলে কাজটি সহজ হয়ে উঠে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হলে কাপড় ধোয়ার

পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এ ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে তুলে ধরা হলো-

(১) লেবেল পরীক্ষা করা এবং বস্ত্র বাছাই করা — একেক প্রকার বস্ত্রের যত্ন যেহেতু একেকভাবে নিতে হয় তাই লেবেল দেখে তন্তু শনাক্ত করে যতদূর সম্ভব ঐ নির্দেশ অনুযায়ী বস্ত্রের যত্ন নিতে হবে। বাছাইকরণের সময় যেসব বস্ত্র একত্রে ধোয়া যাবে সেগুলো একত্রে রাখতে হবে। যেমন– সুতি ও লিনেন বস্ত্র একত্রে ধোয়া যেতে পারে। এছাড়া পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে বস্ত্রগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। যেমন– অল্প ময়লা বস্ত্রাদি, মাঝারি ধরনের ময়লা বস্ত্রাদি, অধিক ময়লা বস্ত্রাদি, সাদা ও রঙিন বস্ত্রাদি, মোজা রুমাল জাতীয় ছোটখাটো বস্ত্রাদি ইত্যাদি।

(২) কাপড় মেরামত করা – বস্ত্রাদি অনেকদিন ব্যবহারের ফলে অনেক সময় একটু আধটু ফেঁসে যায়। পরিষ্কার করার আগে ফেঁসে যাওয়া অংশগুলো রিফু বা তালির মাধ্যমে মেরামত করে নিতে হয়। নতুবা ধোয়ার পর তা আরো ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) দাগ বিমোচন করা – ব্যবহৃত বস্ত্রে অনেক সময় অন্য বস্তুর দাগ লেগে যায়। বস্ত্র ধোয়ার আগে উক্ত দাগ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী অপসারণ করা প্রয়োজন। নতুবা উক্ত দাগ স্থায়ী হবার এবং অন্য বস্ত্রে লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) সাবান ও অন্যান্য উপকরণ নির্বাচন করা– কাপড় কাচার সময় বিভিন্ন ধরনের কড়া সাবান, মৃদু সাবান ও গুঁড়া সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। সুতি ও লিনেন বস্ত্র সাধারণত সাবান বা সোডা দিয়ে কাচা যেতে পারে। তবে মৃদু গুঁড়া সাবান দিয়ে উন্নতমানের সুতি ও লিনেন, রেশমি ও পশমি বস্ত্রাদি ধোয়া যায়। সাদা বস্ত্রকে ধবধবে উজ্জ্বল করার জন্য কাপড়ে নীল ব্যবহার করা হয়। সুতি কাপড়ে প্রয়োজনে মাড় দেয়া যেতে পারে।

(৫) প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি হাতের কাছে রাখা– কাপড় কাচার সময় যেসব উপকরণ ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বালতি, গামলা, মগ, চামচ বা কাঠি, পাতিল, কাপড় কাচার বোর্ড, ব্রাশ, সাকশান ওয়াশার, কাঠের দন্ড, রিঙ্গার ইত্যাদি এবং সম্ভব হলে একটি ওয়াশিং মেশিন।

(৬) ধোয়ার পরিকল্পনা করা– বাড়িতে বিভিন্ন কাপড় ধোয়ার আগে কাপড়গুলো কীভাবে ধোয়া হবে তার একটি পরিকল্পনা করে নিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। কেননা বিভিন্ন বস্ত্র ধোয়ার উপায় ভিন্ন। এখানে রেশমি ও পশমি বস্ত্রের ধোয়ার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হলো।

রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

সতর্কতার সাথে সঠিক উপায় অবলম্বন করে ঘরে পানির সাহায্যে রেশমি বস্ত্র হাতে ধোয়া যায়। এরূপ বস্ত্র অনেকক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। তবে অনেক পুরোনো ও অত্যন্ত বেশি ময়লাযুক্ত

রেশমি বস্ত্র অল্প কিছুক্ষণ হালকা গরম পানি ও মৃদু সাবান দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়।

রেশমি বস্ত্র ধোয়ার প্রথম পর্যায়ে বস্ত্রটি ঝাড়া দিয়ে আলগা ময়লা যতদূর সম্ভব দূর করতে হবে। দাগ লেগে থাকলে সঠিক উপায়ে তা অপসারণ করতে হবে। ধোয়ার জন্য সব সময় হালকা গরম পানি এবং তরল ও মৃদু সাবান ব্যবহার করতে হবে। ময়লা দূর হলে বস্ত্রটি হালকা গরম পানিতে কয়েকবার ধুয়ে সবশেষে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে।

রঙিন রেশমি বস্ত্রগুলো ধোয়ার জন্য রিঠার পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। রিঠাগুলো আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখলে সকালে রিঠার খোসা চটকালে ফেনাযুক্ত পানি পাওয়া যায়। উক্ত পানি দিয়ে রেশম কাপড়ের ময়লা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা যায়। এতে কাপড়ের রং ওঠে না এবং কাপড়ে নকশা করা থাকলে তা নষ্ট হয় না। ভালোভাবে ময়লা দূর হলে প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। দ্বিতীয়বার পানিতে লবণ ও সিরকা গুলে তাতে বস্ত্রটি ধুতে হয়। এতে রঙের চাকচিক্য ফিরে আসবে। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার পর হাত দিয়ে চেপে যতদূর সম্ভব পানি বের করে দিতে হবে। এরপর ছায়ায় শুকাতে দিতে হবে। রোদে বা উচ্চ তাপে শুকালে সাদা রেশমি বস্ত্রে হলুদ দাগ পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং রঙিন রেশমি বস্ত্রের রং অনেক ক্ষেত্রেই উঠে যায়।

রেশমি বস্ত্র ধোয়ার মূল কথাগুলো হচ্ছে :

১) সাধারণত ধোয়ার আগে অনেকক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় না।
২) ধোয়ার সময় হালকা গরম পানি এবং সবশেষে একবার ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে হবে।
৩) ক্ষারজাতীয় সাবান ব্যবহার করা যাবে না।
৪) সব সময় মৃদু পানি ব্যবহার করতে হবে।
৫) কখনো ঘষে ঘষে ময়লা পরিষ্কার করতে নেই, এতে তন্তু ছিঁড়ে যেতে পারে।
৬) রঙিন ও ছাপা রেশমি বস্ত্রে ধোয়ার পানিতে সামান্য লবণ ও সিরকা মিশাতে হবে।
৭) কখনো মোচড়িয়ে পানি নিংড়াতে নেই।
৮) সব সময় ছায়ায় শুকাতে দিতে হবে।

পাঠ ৪ – পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

পশমি বস্ত্র অপেক্ষাকৃত মূল্যবান বস্ত্র এবং অসাবধানতার ফলে অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ধুলোবালি বা ময়লা অত্যন্ত গভীরভাবে এসব বস্ত্রে বসতে পারেনা। এজন্য ধোয়ার আগে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় না। ঝেড়ে ফেললেই আলগা ময়লা বের হয়ে যায়। অন্যান্য বস্ত্রের মতো পশমি বস্ত্রের ক্ষেত্রেও ধোয়ার আগে প্রয়োজনীয় মেরামত করা দরকার এবং কোনো দাগ থাকলে তা অপসারণ করা প্রয়োজন।

হাতে বোনা পশমি কাপড়গুলো নমণীয় প্রকৃতির হয়। ধোয়ার পর প্রায়ই এদের আকৃতি ঠিক থাকে না। এজন্য হাতে বোনা কাপড়গুলো ধোয়ার আগে একটি সমতল কাগজে বিছিয়ে তার মূল নকশাটি এঁকে রাখতে হয়। ধোয়ার পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় পানি অপসারণ করে উক্ত সমতল নকশার উপর পোশাকটি বিছিয়ে দিতে হয় এবং হাত দিয়ে টেনে টেনে পোশাকের মূল আকৃতি ঠিক করে দিতে হয়। হ্যাঙ্গারে বা দড়িতে টাঙ্গিয়ে দিলে এদের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

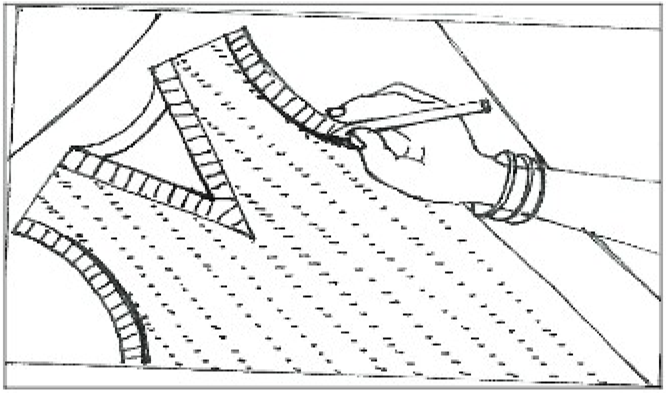

ধোয়ার আগে সমতল কাগজে হাতে বোনা পশমি পোশাকের মূল নকশা অঙ্কন

পশমের বস্ত্র ধোয়ার জন্য হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে হয়। বেশি গরম ও বেশি ঠান্ডা উভয় প্রকার পানিই এসব বস্ত্রের জন্য অনুপযোগী। পানির উষ্ণতা প্রায় ১০০° ফা. হওয়া উচিত। ধোয়ার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পানির তাপমাত্রা একই রকম রাখতে হবে। এরূপ বস্ত্র তাড়াতাড়ি ধুতে হয়। অনেকক্ষণ পানিতে রেখে দিলে এ ধরনের বস্ত্র শক্ত ও সংকুচিত হয়ে যায়।

পশমি বস্ত্র সাধারণত কম ক্ষারযুক্ত মৃদু সাবান, গুঁড়া সাবান, রিঠার পানি প্রভৃতি দিয়ে ধুতে হয়। একটি বড় গামলায় হালকা গরম পানিতে সাবান গুলে তার মধ্যে কাপড় ভেজাতে হয়। তারপর হালকাভাবে দুহাত দিয়ে নেড়েচেড়ে ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। পশমি বস্ত্র বেশিক্ষণ পানিতে রাখা ঠিক নয়। এতে কাপড় দুর্বল হয়ে যায়। কাপড় ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে গেলে সমতাপমাত্রার পরিষ্কার পানি দিয়ে তিন-চারবার ধুয়ে সাবান ছাড়াতে হয়। একই সাথে দুই বা তিনটি গামলা ও সমান তাপমাত্রার পানি নিয়ে কাজ শুরু করলে কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়।

ধোয়ার কাজ শেষ হলে দুহাতের তালুর সাহায্যে একটু চাপ দিয়ে বস্ত্র থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কখনো নিংড়িয়ে পানি বের করতে নেই। এরপর তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে বাকি পানি শুষে নিতে হবে।

পশমি বস্ত্র মৃদু সূর্যালোকে বা ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। মেশিনে বোনা বস্ত্রাদি দড়িতে শুকাতে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু হাতে বোনা বস্ত্র শুকানোর সময় আগের আঁকা কাগজের ওপর সমতল অবস্থায় রেখে

আকৃতি ঠিক করে দিতে হয়। ধোয়ার সময় বস্ত্র যে সংকুচিত হয়, শুকাবার সময় বারবার টেনে দিলে তা দূর হয় এবং বস্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি বজায় থাকে। পশমি বস্ত্র মোটা ও ভারী প্রকৃতির হওয়ায় শুকাবার সময় মাঝে মাঝে কাপড়গুলো এপিঠ-ওপিঠ করে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়।

পশমি বস্ত্র ধোয়ার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে–

১. কখনো খুব গরম বা খুব ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা যাবে না।

২. অতিরিক্ত ক্ষারজাতীয় সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা যাবে না।

৩. কখনো ঘষে ময়লা পরিষ্কার করা যাবে না।

৪. ভেজা অবস্থায় বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না।

৫. মোচড়িয়ে পানি নিংড়ানো যাবে না। এতে তন্তুগুলো ছিঁড়ে যেতে পারে।

৬. সূর্যালোক বা অতিরিক্ত গরম স্থানে শুকাতে দেয়া যাবে না।

কাজ– রেশমি ও পশমি বস্ত্র ধোয়ার পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করো।

পাঠ ৫–মাড় দেওয়া

অপরিচ্ছন্ন পোশাকের দাগ তোলা ও ধৌতকরণের পরবর্তী পর্যায়ের কাজ হলো কাপড়ে কিছুটা কাঠিন্য ও চকচকে ভাব আনা। আর পোশাকে কাঠিন্য আনার জন্য যা কিছুই ব্যবহার করা হয় তা আসলে স্টার্চ বা শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ। যেমন– ভাতের মাড়, ময়দা, এরারুট, বার্লি, গঁদের কলপ প্রভৃতি।

মাড় প্রয়োগের ফলে–

- পোশাকের চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।
- পরিমাণমতো এবং সঠিক নিয়মে মাড় দিলে ধোয়া নরম পোশাকে কাঠিন্য ও নতুনত্ব ফিরে আসে।
- মাড়ের আস্তরণ পোশাকে ময়লা লাগায় বাধা সৃষ্টি করে।
- পোশাকের আরাম, সৌন্দর্য ও পারিপাট্য বাড়ায়।

মাড় প্রয়োগের নিয়ম

প্রচলিত মাড়ের মধ্যে ভাতের মাড়ই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এরারুট কিংবা ময়দা ঠান্ডা পানিতে গুলিয়ে জ্বাল দিয়ে মাড় তৈরি করে নেয়া যায়। মাড়ের ঘনত্ব কতটা হবে তা নির্ভর করে কাপড়ে কতটা কাঠিন্য আনা হবে তার উপর।

- পোশাকে ব্যবহারের পূর্বে মাড় ছাকনি অথবা পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।
- পোশাক উল্টো করে মাড়ে ভিজাতে হয়।
- ভারী পোশাকে হাল্কা এবং পাতলা পোশাকে ঘন মাড় দিতে হয়।
- গরম মাড় পোশাকে কম ধরে ও রঙিন পোশাকের রং নষ্ট করে। এজন্য মাড় ঠান্ডা হলে ব্যবহার করতে হয়।
- কালো ও সাদা পোশাকের ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানিতে নীল গুলে পুরো মাড়ে মিশিয়ে নিলে কাপড়ে মাড়ের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় না এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে।
- মাড় প্রয়োগের পর পোশাকটি ভালোমতো শুকিয়ে না নিলে খারাপ গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে।
- রেশমি বস্ত্রে মাড় দেয়ার প্রয়োজন হয় না, পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই কাপড় কিছুটা দৃঢ় হয়ে যায়। তবে যদি মাড় দিতেই হয় তবে প্রয়োজনমতো হালকা মাড় ব্যবহার করা যেতে পারে। ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে হলে মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে ৩ ছটাক পানিতে ১ চা চামচ মেথিলেটেড স্পিরিট গুলে কাপড়টি তাতে ডুবিয়ে নিতে হয়।
- পশমি বস্ত্রেও মাড় দেয়ার প্রয়োজন হয় না, তবে সাদা পশমি বস্ত্রগুলো শেষবার পানি দিয়ে ধোয়ার সময় ঐ পানিতে কয়েক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে বস্ত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। রঙিন বস্ত্রগুলোর ক্ষেত্রে ভিনেগার ও লবণ পানির সাথে মিশিয়ে নিলে বস্ত্রের উজ্জ্বলতা ফিরে আসে।
- মাড় দেয়া পোশাক রোদে শুকানোর সময় ভালোভাবে ঝেড়ে টান টান করে শুকাতে দিতে হয়। তা না হলে শুকনো কাপড় ইস্ত্রি করতে কষ্ট হয়।

মাড় দেওয়া কাপড় রোদে শুকানো

পাঠ ৬ –ইস্ত্রি করা

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা জেনেছি যে, পোশাকের বিভিন্ন অংশ ছাঁটার আগে ও সেলাই করার পর তাদের আকৃতি সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হয়। এছাড়া পোশাক ধোয়ার পর শুকালে তা কুঁচকিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারায়। তাই পোশাকের সৌন্দর্য ও পারিপাট্য বাড়ানোর জন্যও ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রির মাধ্যমে তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে কাপড়ের ভাঁজ ও কুঞ্চন দূর করা হলে পোশাক চকচকে এবং পরিষ্কার দেখায়। ইস্ত্রি করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হলো–

ইস্ত্রি	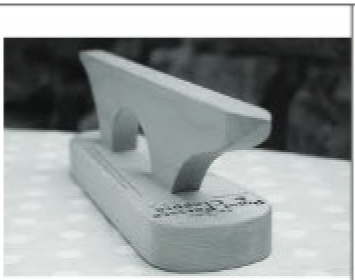 স্লিভ বোর্ড	ইস্ত্রি বোর্ড

- **ইস্ত্রি**–আমাদের দেশে সাধারণত ৩ ধরনের ইস্ত্রি দেখা যায়।

১) কয়লার ইস্ত্রি–এটি অত্যন্ত পুরোনো মডেলের ইস্ত্রি। এই ধরনের ইস্ত্রির উপরের ঢাকনা খুলে জ্বলন্ত কয়লা ভরতে হয়। জ্বলন্ত কয়লার উত্তাপে ইস্ত্রি গরম হয়। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকাতে কাপড় পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও জ্বলন্ত কয়লা বের হলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

২) লোহার পাতের ইস্ত্রি – এধরনের ইস্ত্রি সাধারণত চ্যাপ্টা, মোটা, পেটা লোহার পাতের হয়ে থাকে। এই ইস্ত্রিগুলো চুলার উপর বসিয়ে গরম করে পোশাকের উপর চালানো হয়। তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকাতে অসতর্ক হলে কাপড় পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

৩) ইলেকট্রিক ইস্ত্রি– এটি বিদ্যুৎচালিত এবং ব্যবহারে অত্যন্ত সুবিধাজনক আধুনিক ইস্ত্রি। তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকাতে অল্প সময়ে সব তন্তুর পোশাকই ইস্ত্রি করা যায়।

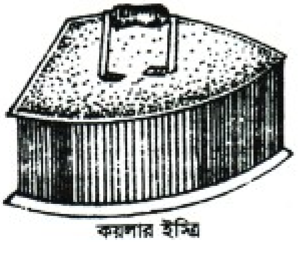 কয়লার ইস্ত্রি	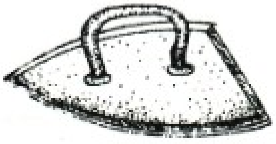 লোহার পাতের ইস্ত্রি	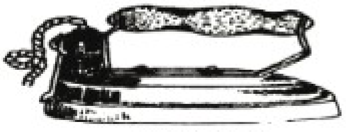 ইলেকট্রিক ইস্ত্রি

- **ইস্ত্রি করার বোর্ড–** ইস্ত্রি করার জন্য একটি ইস্ত্রি বোর্ড বা সমতল টেবিল প্রয়োজন। যার উচ্চতা একজন মানুষের কোমড় পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই বোর্ডের ডানপাশে গরম ইস্ত্রি রাখার ব্যবস্থা থাকে।

❖ কম্বল বা চাদর– ইস্ত্রি বোর্ডের উপর ব্যবহারের জন্য পুরু কম্বল কিংবা চাদর দরকার।

❖ স্লিভ বোর্ড– পোশাকের হাতা, কাফ, কলার ইত্যাদি সুন্দরভাবে ইস্ত্রির জন্য স্লিভ বোর্ড লাগে।

এছাড়া ইস্ত্রির সময় কাপড় ভিজানোর জন্য স্প্রেয়ার, ছোট তোয়ালে, পানির বাটি, নরম পাতলা কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

ইস্ত্রি করার নিয়ম– ১. ইস্ত্রি করার পূর্বেই ইস্ত্রিটিতে কোনো কিছু লেগে থাকলে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তা না হলে পোশাকে দাগ লেগে যেতে পারে।

২. পোশাকের তন্তুর ধরন অনুযায়ী উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩. নকশা করা বা রঙিন পোশাক উল্টোদিকে ইস্ত্রি করলে নকশা, রং নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

৪. কাপড়ের লেবেল অনুযায়ী ইস্ত্রি করা উচিত। সুতিবস্ত্র কিছুটা আর্দ্র থাকা অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়। কাপড়টি যদি শুকিয়ে যায় তবে পানির ছিটা দিয়ে একটি ভেজা তোয়ালে দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট পেঁচিয়ে রেখে তন্তু নরম করে নিতে হয়।

৫. রেশমি বস্ত্র কিছুটা ভেজা অবস্থাতেই ইস্ত্রি করতে হয়। কারণ একবার শুকিয়ে গেলে তা আবার পানি ছিটিয়ে আর্দ্র করলে কাপড়ে দাগ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে বস্ত্রটি পুনরায় ভেজাতে হয়। বেশি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করলে রেশমি তন্তু পুড়ে যায়। সাধারণত এরূপ বস্ত্র উল্টো দিকে ইস্ত্রি করা উচিত।

৬. পশমি বস্ত্রের ক্ষেত্রে বস্ত্রগুলো সামান্য ভেজা থাকতেই অল্প গরম ইস্ত্রি দিয়ে উল্টোদিকে চাপ দিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি স্যাঁতসেঁতে পাতলা সুতির কাপড় পশমি কাপড়ের ওপর বিছিয়ে ইস্ত্রি করতে হয়। কখনো খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করতে নেই।

৭. সব সময় সরল রেখায় ইস্ত্রি চালনা করা ভালো।

৮. পোশাক ইস্ত্রি করার সময় সঠিকভাবে ভাঁজ করে নিতে হয়। ভাঁজে ভাঁজে গরম ইস্ত্রির চাপ পড়লে কাপড় তাড়াতাড়ি মসৃণ হয়।

৯. ইস্ত্রি করার পর কাপড় কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রেখে জলীয়বাষ্প বের করে যথাযথ স্থানে রাখতে হয়।

> কাজ–তোমার একটি পোশাক মাড় দিয়ে, ইস্ত্রি করে, সঠিকভাবে ভাঁজ দিয়ে শ্রেণিকক্ষে আনবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. পুরোনো কাদার দাগ তুলতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. ভিনেগার খ. সাবান পানি

গ. অক্সালিক এসিড ঘ. গ্লিসারিন

২. পোশাকের কাঠিন্য বজায় রাখতে ভাতের মাড়ের বিকল্প হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা যায়?

ক. এসিটোন খ. এরারুট

গ. বোরাক্স ঘ. অ্যামোনিয়া

নিচের উদ্দীপকটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুপুরে ভাত খাবার সময় হঠাৎ করে খোদেজার শাড়িতে অসাবধানতাবশত মাংসের তরকারির ঝোল লেগে যায়। খাবার শেষে তিনি তার শাড়িটি পাল্টিয়ে পরের দিন ধোয়ার জন্য রেখে দেন।

৩. শাড়ির দাগটি তোলার জন্য খোদেজা প্রাথমিক অবস্থায় কী ব্যবহার করতে পারতেন?

ক. ঠান্ডা পানি খ. সাবান পানি

গ. জাভেলী ওয়াটার ঘ. লবণগোলা পানি

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে দাগটি অপসারণ করতে গেলে খোদেজার–

i. দাগ অপসারণ করা কঠিন হবে

ii. শাড়িটির গ্রহণযোগ্যতা কমে যেতে পারে

iii. রাসায়নিক অপসারক দ্রব্যের প্রয়োজন হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. সায়মা সব সময় মাথায় মেহেদী ব্যবহার করেন। একদিন তার জামায় মেহেদীর রং লেগে গেলে তিনি সেটিকে ডিটারজেন্ট দিয়ে ভিজিয়ে রাখেন। জামাটির সাথে সাদা সুতি শাড়ি ও অধিক ময়লাযুক্ত বিছানার চাদরটিও ভিজিয়ে রাখেন। কাপড়গুলো ধোয়ার পর দেখা গেল তার শাড়িটিতে জামার মেহেদীর রং লেগে পরার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

ক. রেশম তন্তুর তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে কোন মাড় বেশি উপযোগী?

খ. কাপড়ে মাড় দিতে হয় কেন?

গ. সায়মার আহমেদের জামাটি থেকে দাগ অপসারণের উপায় ব্যাখা করো।

ঘ. পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সায়মা কি যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো।

২. সারা ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। তার পোশাক সব সময় তার মা ধুয়ে ইস্ত্রি করে দেন। দীর্ঘদিন ব্যবহারের পরও তার কাপড়গুলোকে নতুনের মতো দেখায়। কয়েকদিন যাবত মা অসুস্থ। তাই এ সপ্তাহে ছুটির দিনে সারা নিজেই তার সাদা রঙের সুতি কাপড়ের স্কুল ড্রেসটি ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে ধুয়ে শুকাতে দেয়। কিন্তু ধোয়ার পর তার ড্রেসটি পরিষ্কার হলেও তত সাদা হলো না। তার ধোয়া কাপড়গুলো ইস্ত্রি করার পর একটি নাইলনের ওড়না ইস্ত্রি করার সময় সেটি পুড়ে যায়। পরবর্তি সময়ে সারা অন্য আরেকটি জামা ইস্ত্রি করতে গেলে সেটিতেও দাগ লেগে যায়।

ক. বল পয়েন্ট কলমের দাগ তুলতে কী ব্যবহার করা হয়?

খ. কাপড় ধোয়ার পূর্বে পোশাকের দাগ অপসারণ করতে হয় কেন?

গ. কাপড় ধোয়ার সময় প্রয়োজনীয় কোন উপকরণটি সারা ব্যবহার করেনি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কাপড় ইস্ত্রির নিয়মগুলো সারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি– বিশ্লেষণ করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

সুস্থ দেহ সুন্দর মন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।